من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

৮ম, ৯ম, ও ১০ম খণ্ড

[তৃতীয় ভলিউম]

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্‌ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্বদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্‌ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার
শামসুল হক
৩১/৭/৮৬ হিজরী

■ সূচী-পত্র ■

বিষয় — পৃষ্ঠা

অষ্টম খণ্ড

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু ১
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চারি কন্যা, পাঁচ পুত্র ২
রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদত-আখ্‌লাক ৩

আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হযরত হাওয়া (আঃ),
হযরত সারা (আঃ) ৫
হযরত হাজেরা (আঃ) ৬
হযরত ইসমাঈলের বিবির কাহিনী ৭
বাদশাহ নমরুদের কন্যা ৮
আইয়ুব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা,
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা ৯
হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা,
হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী ১০
হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা ১১
হযরত বিবি আছিয়া,
ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী ১২
হযরত মূসার এক বৃদ্ধা লস্কর ১৩
হাইসূরের ভগ্নী, হযরত বিলকিস ১৪
বনি-ইস্রায়ীলের এক দাসী ১৫
বনি-ইস্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী,
হযরত বিবি মরইয়ম ১৬
হযরত খাদিজা, হযরত সওদা, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা ১৭
হযরত হাফ্‌সা, হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ ১৮
হযরত যোয়ায়রিয়াহ ১৯
হযরত মায়মুনাহ্, হযরত সফিয়া ২০
হযরত যয়নব, হযরত রোকেয়া,
হযরত উম্মে কুলসুম, হযরত ফাতেমা (রাঃ) ২১
হযরত হালিমা সাআদিয়া, হযরত উম্মে সলিম ২২
হযরত উম্মে হারাম, হযরত আবু হুরায়রার মাতা ২৩
ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা, হযরত ফাতেমা নিশাপুরী ২৪
হযরত রবিয়া বিন্‌তে ইসমাঈল, হযরত মায়মুনা সওদা ২৫
হযরত ছারি সাক্বাতির মুরীদ, হযরত তোহ্‌ফা ২৬
শাহ ইবনে-সোজা কারমানির কন্যা ২৭

বিষয় পৃষ্ঠা

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস ২৮
সংশোধনমূলক কাহিনী ৩২
ওয়ায়েলার কাহিনী, হযরত লূত (আঃ)-এর বিবি,
কাফের আওরত ছদুফের কাহিনী ৩৩
আরবিলের কাহিনী ৩৪
নায়েলার কাহিনী, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী ৩৫
মহান আবেদের বিবির কাহিনী,
হযরত জুরীহের তোহমতকারিণী আওরত ৩৬
বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত,
ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত ৩৭
বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত,
যায়দা বিন্‌তে আশআবের কাহিনী ৩৮
বিবি যুলেখার কাহিনী, কারূণের ধোঁকাবাজ আওরত ৩৯
গোনাহ স্বীকারকারিণী আওরত,
রাসূলে মাকবুলের পাক শামায়েল ৪০

নবম খণ্ড

স্বাস্থ্যই সুখের মূল ৪৯
খাদ্য ৫১
গম ৫২
মাংস বর্গ, পাখী ৫৩
মাছ বর্গ ৫৪
ডাইল বর্গ, তরকারী ৫৫
শাক বর্গ ৫৬
তৈল বর্গ, ঘৃত বর্গ, দুগ্ধ বর্গ ৫৭
অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণাগুণ, গুড়বর্গ ৫৮
ফল বর্গ ৫৯
মোছলেহাত বর্গ ৬১
লবণ বর্গ, মধু বর্গ ৬২
অন্ন বর্গ, মিষ্টান্ন বর্গ, পরিশ্রম ৬৩
বিশ্রাম, চিত্ত বিনোদন, ক্রন্দন ৬৪
নিদ্রা, নিদ্রার সময় ৬৫
নিদ্রার নিয়ম, নিদ্রার সময় সাবধানতা, পানি ৬৬
অধঃগতি, সংযম ৬৭
সমাধান ৬৮
সাবধানতা ৬৯
বিশেষ সতর্কীকরণ ৭০
শিরঃ পীড়া ৭১

বিষয়	পৃষ্ঠা
মাথা বেদনার চিকিৎসা, তদবীর	৭২
প্রতিশ্যায় সর্দি, তদবীর, উন্মাদ	৭৪
উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ	৭৫
স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদবীর	৭৭
মৃগী, তদবীর	৭৮
চুল, চক্ষু রোগ	৭৯
চক্ষু উঠা	৮০
দৃষ্টিশক্তি হীনতা, তদবীর	৮১
কর্ণ রোগ	৮২
নাসিকা রোগ, তদবীর, সর্দি, জিহ্বা	৮৩
দন্ত রোগ, মুখের দুর্গন্ধ, গণ্ডমালা ও গলগণ্ড	৮৪
বক্ষ, চন্দনাদ্য তৈল প্রস্তুত প্রণালী	৮৫
রাজ যক্ষ্মা, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ	৮৬
তদবীর, হৃদ রোগ	৮৭
তদবীর	৮৮
পথ্যাপথ্য, জঠর পীড়া	৮৯
অগ্নিমান্দ্য	৯০
অতিসার, প্রবাহিকা	৯১
তদবীর	৯২
শূল বা নিদারুণ বেদনা	৯৩
তদবীর, শোথ ও জলোদরী	৯৪
তদবীর, ক্রিমি, প্লীহা-যকৃত	৯৫
পাণ্ডু, কামলা, হলিমক, তদবীর	৯৬
গুর্দা, মূত্রাশয়	৯৮
তদবীর	৯৯
পাথরী	১০০
তদবীর, জরায়ু	১০১
অধিক রক্তস্রাব, তদবীর	১০২
শ্বেত প্রদর, তদবীর	১০৩
গর্ভ	১০৪
গর্ভবতীর সাবধানতা, গর্ভবতীর রক্তস্রাব, গর্ভবতীর অকাল বেদনা	১০৫
তদবীর	১০৭
জন্ম নিয়ন্ত্রণ	১০৮
গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা	১১২
গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা	১১২
প্রসব বেদনা, গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল বাহির করিবার উপায়	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তদবীর	১১৪
প্রসূতির পথ্যাপথ্য, যৌন ব্যাধি (প্রমেহ), চিকিৎসা	১১৬
রস প্রয়োগ, পথ্যাপথ্য, প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ	১১৭
ধ্বজভঙ্গ, চিকিৎসা	১১৮
প্রস্তুত প্রণালী, লিঙ্গ ব্যাধি	১২১
গণোরিয়া, চিকিৎসা, গর্মি (সিফলিস), চিকিৎসা	১২২
তদবীর	১২৩
যোনি ব্যাধি, চিকিৎসা, বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ, স্বপ্নদোষ	১২৪
তদবীর, কোষ ব্যাধি, একশিরা কুরণ্ড ও অন্ত্র বৃদ্ধি, চিকিৎসা	১২৫
গুহ্যদ্বার ব্যাধি	১২৬
চিকিৎসা, তদবীর	১২৭
ভগন্দর, তদবীর	১২৮
অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য, বাগী, শ্লীপদ (গোদ)	১২৯
তদবীর, গোড়শূল	১৩০
সর্বাঙ্গীন, ফোঁড়া ও ব্রণ	১৩১
নালী ঘা	১৩২
জ্বর, বাত জ্বর	১৩৩
চিকিৎসা, দ্বিদোষজ জ্বর, চিকিৎসা, পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর	১৩৪
বাত শ্লেষ্মা জ্বর, চিকিৎসা, ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর	১৩৫
কর্ণমূল জাত শোথ, চিকিৎসা, বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা	১৩৬
পালা জ্বর, তদবীর, গরম লাগা জ্বর	১৩৭
জ্বরের পথ্যাপথ্য	১৩৯
অগ্নিদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা, দাদ, কাওর চিকিৎসা, খোস চুল্কনা, মুখের মোচতা	১৪০
পিট চাল, তদবীর, আঘাত, শ্বিত্র রোগ (পাতরী), চিকিৎসা, বিষ চিকিৎসা	১৪১
স্থাবর বিষ চিকিৎসা, জঙ্গম বিষ চিকিৎসা, তদবীর	১৪২
কুকুরের বিষ	১৪৩
জলাতঙ্ক, বাল্য রোগ, হেরযে আবী দোজানা	১৪৪
স্তন্য-দুগ্ধ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ, উম্মুছ-ছিবইয়ান	১৪৬
শিশুর ক্রন্দন, শিশুর কর্ণ রোগ, তদবীর	১৪৭
শয্যা-মূত্র, শিশুর জ্বর, কলেরা, বসন্ত	১৪৮
প্লেগ	১৪৯
বেদনা-শূল বেদনা	১৫১
স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য	১৫২
জ্বর, শোথ ফোঁড়া, সাপ, বিচ্ছু, বোলতা দংশন, বদ নজর, বসন্ত, সর্বপ্রকার ব্যাধিতে	১৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভাব-অনটন দূর করণার্থে, মুশকিল, জ্বীন	১৫৪
পরীক্ষা ও জ্বীন হাজির	১৫৫
বন্ধন	১৫৭
শাস্তি	১৫৮
বন্ধ	১৬৬
বাড়ী বন্ধ, বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ	১৬৯
জ্বীন ও ইনসানের যাদু	১৭১
আমেলের কর্তব্য	১৭৩
অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ, হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য	১৭৪
চুরি	১৭৫
পলাতক মানুষ হাযির করিবার তদবীর	১৭৬
দশম খণ্ড	
নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা	১৭৮
কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়	১৮৩
শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ	১৮৭
শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা	১৯৪
কতিপয় জরুরী উপদেশ	১৯৬
অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা	২০১
কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুযুর্গ যাঁহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন	২০২
জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়, সাবান প্রস্তুত প্রণালী	২০৩
সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতি	২০৫
সাবানের উপাদানের তালিকা, প্রস্তুতের নিয়ম, কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম	২০৬
লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী, ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম, কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম, বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম, তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম	২০৭
তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম, সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম, গোশ্‌ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না	২০৮
গোস্‌ত পাকানের ২য় নিয়ম, বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী	২০৯
পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম	২১০
নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম, মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম, নিমকী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম	২১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম, চাস্‌নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম, শালগমের আচার, নবরত্ন চাট্‌নী তৈয়ার করার নিয়ম, মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম	২১২
নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী, লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম, কাপড় রংগাইবার নিয়ম, হলুদ রং	২১৩
সোনালী আভা রং, সোনালী রং করার অন্য নিয়ম, গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম, সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী, বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী, লাল-আভা পাকা গাড় বেগুনী রং	২১৪
চকলেট রং, বাদামী বা হালকা জরদ রং, লাল পাকা রং	২১৫
পেস্তা রং, পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম, নীল রং, খাদ্য অধ্যায়	২১৬
ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ	২১৭
স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা	২১৮
কোন্ খাদ্যে কতগুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা	২১৯
দ্রব্য গুণ	২২৩
তরি-তরকারি	২২৪
দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ	২২৫
মসল্লাদির গুণাগুণ	২২৭
হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম, হিসাবের নমুনা	২২৯
পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী	২৩১
বুক-পোষ্টের নিয়ম	২৩৩
বীমা বা ইন্‌সিওরের নিয়ম	২৩৪
ভি, পি-এর নিয়ম, মণিঅর্ডারের নিয়ম, টেলিগ্রামের নিয়ম	২৩৫
পাসপোর্ট ও ভিসা	২৩৬

—■—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বেহেশ্‌তী জেওর

অষ্টম খণ্ড

□

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু

রাসূলে করীমের মোবারক নাম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তাঁহার পিতার পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব, তাঁহার পিতার নাম হাশেম, হাশেমের পিতা আব্‌দে মনাফ।

রাসূলে করীমের মাতা আমেনা। আমেনা ছিলেন অহবের কন্যা। অহবের পিতা আব্‌দে মনাফ। তাহার পিতা যোহরা। উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীমের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের আব্‌দে মনাফ একই জন নহেন—ভিন্ন ব্যক্তি।

কাফের বাদশাহ আবরাহা যে বৎসর হস্তী সহকারে খানায়ে কা'বা ধ্বংস করিতে আসে—সেই সালের বারই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন। সেদিনটি ছিল সোমবার। জন্মের কয়েক মাস পর হইতে শিশু নবী ধাত্রী গৃহে লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে ধাই-মা হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার গৃহে ফিরাইয়া দেন। ছয় বৎসর বয়সে মাতা আমেনা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন মাতুলালয় মদীনার বনী-নাজ্জারে গমন করেন। ফিরিবার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে এন্তেকাল করেন। সঙ্গীয়া দাসী উম্মে আয়মন বালক নবীকে সঙ্গে করিয়া মক্কায় পৌঁছেন।

পিতা আবদুল্লাহ্ নবী করীমকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াই এন্তেকাল করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদার লালন-পালনে তিনি বড় হইতেছিলেন। আল্লাহ্‌র মহিমা অপার—মানুষের বুঝা ভার। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। এইবার তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার চাচা আবু তালিব আপন কাঁধে তুলিয়া নিলেন।

একবারের এক ঘটনা। নবীকে সঙ্গে করিয়া চাচা আবু তালিব সিরিয়া তেজারতে চলিলেন। পথিমধ্যে নাছারা ধর্ম যাজক 'বুহাইরার' সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বুহাইরা আবু তালিবকে বলিল—খবরদার! এই বালককে হেফাযত কর। এই বালকই ভাবী নবী, আখেরী পয়গম্বর। এতদ্‌শ্রবণে আবু তালিব বিস্মিত ও চম্‌কিত হইলেন—আনন্দে অবিভূত হইলেন। বুহাইরার পরামর্শে তিনি বালক নবীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

বালক নবী যুবক হইয়াছেন। বিবি খাদিজার মাল লইয়া তেজারতে চলিয়াছেন। পথে বিজ্ঞ-সাধু ব্যক্তি 'নস্তুরা' তাঁহাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ দিল। তেজারত শেষে তিনি মক্কায় ফিরিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা তাহেরা সচ্চরিত্রা বিবি খাদিজার সহিত তাঁহার শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হইল। এই সময় নবী করীমের বয়স পঁচিশ বৎসর, বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ্ চল্লিশ বৎসর বয়সে নুবুওত প্রাপ্ত হন। তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মে'রাজ শরীফ গমন করেন। তিনি নুবুওত লাভের সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল মাতৃভূমি মক্কাতেই ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। তাঁহার মদীনা আগমনের দ্বিতীয় বৎসরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রথম জেহাদ জংগে বদর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবনে মোট এগারটি শাদী করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই দুইজন স্ত্রী এন্তেকাল করেন। একজন হযরত খাদিজা (রাঃ), দ্বিতীয়জন যয়নব বিন্‌তে খোযায়মা (রাঃ) বাকী নয়জনকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জান্নাতী হন।

১। হযরত সওদা রাযিআল্লাহু আনহা
২। হযরত আয়শা রাযিআল্লাহু আনহা
৩। হযরত হাফছা রাযিআল্লাহু আনহা
৪। হযরত উম্মে হাবিবা রাযিআল্লাহু আনহা
৫। হযরত উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা
৬। হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ রাযিআল্লাহু আনহা
৭। হযরত জোয়ায়রিয়া রাযিআল্লাহু আনহা
৮। হযরত মায়মুনা রাযিআল্লাহু আনহা
৯। হযরত সাফিয়া রাযিআল্লাহু আনহা

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চারি কন্যাঃ

১। হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা
২। হযরত রোকেয়া রাযিআল্লাহু আনহা
৩। হযরত উম্মে কুলসুম রাযিআল্লাহু আনহা
৪। হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা

পাঁচ পুত্রঃ

তাঁহাদের সকলেই বাল্যকালে এন্তেকাল করেন। একমাত্র হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই জন্ম নিয়াছিলেন চারিজন। তাঁহার হইতেছেন—

১। হযরত কাসেম রাযিআল্লাহু আনহু
২। হযরত আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু
৩। হযরত তৈয়্যব রাযিআল্লাহু আনহু
৪। হযরত তাহের রাযিআল্লাহু আনহু

পঞ্চম পুত্র হযরত ইব্‌রাহীম (রাঃ) জন্ম নিয়াছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভে। মক্কা শরীফে তিনি জন্ম নিয়া শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ নুবুওতের পর মক্কা শরীফে পয়দা হইয়া বাল্যেই এন্তেকাল করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ নুবুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নুবুওতের পূর্বেই এন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর তেষট্টি বৎসরের জেন্দেগীর দশ বৎসরকাল মদীনা মনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার কার্যে অতিবাহিত করেন। ছফর মাসের দুইদিন বাকী থাকিতে (বুধবার) তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশ্‌তের ওয়াক্তে তিনি ওফাত পান।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম মোবারক আলী ও উমামা। হযরত রোকেয়া (রাঃ)-এর গর্ভে আবদুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। কিন্তু ছয় বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) নিঃসন্তান। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম। তাঁহাদের বংশধরগণ দ্বারাই দুনিয়াতে নবী বংশ জারি আছে। কিন্তু দৈহিক বংশের চেয়ে রূহানী বংশের সংখ্যাই অধিক।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদত-আখ্‌লাক

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছিলেন দয়ার দরিয়া। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। কিছু না কিছু তিনি প্রার্থীকে দান করিতেনই। তৎক্ষণাৎ দান করিতে না পারিলে অন্য সময়ে দান করিবার ওয়াদা করিতেন। সদা সত্য কথা বলিতেন। মিথ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না—সর্বদা ঘৃণা করিতেন। নম্রতা ও কোমলতায় ছিল তাঁহার দেল ভরপুর। ধীর, স্থির, শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁহার আদত। কটু কথা তিনি কখনও বলিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌র চরিত্রে অসাধারণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি চিরদিন ছিলেন সরল, মুক্ত উদার, সুন্দর, কল্যাণময়। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-তকলিফ না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে নিঃশব্দে জুতা পায়ে দিয়া নীরবে দরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইতেন। বাহিরের যরুরত পুরা করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে ঘরে প্রবেশ করিতেন। কাহারো ঘুম নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না। হাঁটিবার সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিতেন। সঙ্গীদের সহিত চলিবার সময় পিছনে চলিতেন। কাহারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম করিতেন। বসিবারকালে খুব আজেযীর সহিত বসিতেন। আহার করিবার সময় নেহায়েত তা'যীমের সহিত আহার করিতেন। কখনও পেট পুরিয়া খাইতেন না। সুস্বাদ বিলাস দ্রব্য আহার করা পছন্দ করিতেন না। হামেশা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই জন্যই অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। বেলা-যরুরত কথা কহিতেন না। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—যাহাতে কথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট না হয়। কথাকে খুব লম্বা ও খুব খাট করিয়া বলিতেন না। ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নম্রতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার খেদমতে কেহ হাজের হইলে তাহার যথার্থ সম্মান করিতেন এবং তাহার বক্তব্য খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শরীঅত বিরোধী কথা বলিতে শুনিলে উহাতে বাধা দিতেন, অথবা নিজে দূরে সরিয়া পড়িতেন। অতি নগণ্য বস্তুকেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম নেয়মাত বলিয়া গণ্য করিতেন। কোন নেয়ামতকেই তিনি মন্দ বলিতেন না। এমন উক্তিও করিতেন না যে, উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল নয়। অগত্যা কোন চীজ নিজের মোয়াফেক না হইলে উহা খাইতেন না বা তারীফ করিতেন না। কোন জিনিসের কোন দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতেন না। কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কোন লোকসান কাহারও দ্বারা হইলে বা কোন কাজকে কেহ বিগড়াইয়া ফেলিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে রহিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাকিছু করিয়াছি সেই সম্পর্কে তিনি

কোনদিন এমন বলেন নাই যে, ইহা কেন করিয়াছ বা ইহা কেন কর নাই? কিন্তু শরীঅতের সীমা লঙ্ঘন করিলে তখন রাসূলুল্লাহ্‌র রাগকে কিছুই দমাইয়া রাখিতে পারিত না। নিজস্ব স্বার্থের জন্য তিনি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যাহার প্রতি রাগ হইতেন, তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন মাত্র—ভালমন্দ কিছুই বলিতেন না। কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার লজ্জা অবিবাহিতা মেয়ের চাইতেও বেশী ছিল।

প্রয়োজন বোধে মৃদু হাস্য করিতেন। উচ্চৈঃস্বরের হাসিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলের সহিত মিল-মহব্বত বজায় রাখিয়া চলিতেন। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কখনও নিজকে বড় মনে করিতেন না। মাঝে মাঝে সত্য কথার মাধ্যমে হাসি মযাক করিতেন। নফল এবাদত নামায এত অধিক পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। কোরআন শরীফ পড়িবার ও শুনিবারকালে আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেন। সঙ্গী-সাথীগণকে প্রশংসায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেন। দীনহীন লোকের ডাকে সাড়া দিতেও বিলম্ব করিতেন না। রোগী চাই সে গরীব হউক, চাই সে আমীর হউক তাহার হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করিতেন। ধনী-গরীব সবার জানাযায়ই তিনি শরীক থাকিতেন। কোন গোলাম বা বান্দীর দাওয়াতকেও তিনি সাগ্রহে কবূল ফরমাইতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কখনও এইরূপ প্রকাশ পাইত না যাহাতে কেহ নিরাশ হয় বা ঘাবড়াইয়া যায়।

যালেম দুশ্‌মনের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অথচ দুশমনের সহিত অতি নম্র, ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং হাসি মুখে কথাবার্তা কহিতেন। বসিবার সময়, দাঁড়াইবার সময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতেন। কোন মহফিলে হাজের হইলে সর্ব-সাধারণের আসনেই উপবেশন করিতেন। জনসাধারণকে রাখিয়া কখনও উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। কতিপয় লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সকলের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিতেন। প্রত্যেকের সহিতই এমন দিলখোলা ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সকলেই ভাবিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) আমাকেই বেশী মহব্বত করেন। কেহ তাঁহার খেদমতে বসিলে বা কথা বলিতে লাগিলে, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা সে ব্যক্তি না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। অধিকাংশ গৃহস্থালী কার্য তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। যাবতীয় কার্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। অতি সাধারণের সহিতও তিনি বড়ই নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত মিশিতেন। কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলেও তিনি মুখের উপর ধমকি দিতেন না। ঝগড়া, ফাসাদ ও শোরগোলকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার অপরাধ মার্জনা করিতেন। কোন খাদেমা, গোলাম বা স্ত্রীলোক এমন কি কোন জানোয়ারকেও তিনি স্বহস্তে প্রহার করিতেন না। অবশ্য শরীঅতের হুকুম মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সেটা পৃথক কথা। কোন যালেমের যুলুমের বদলা তিনি নিতেন না। তাঁহার চেহারা মেবারকে সদা হাসি ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু দেল সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বেফিকির কোন কথাই কহিতেন না। তাড়াতাড়ি কাহারও কুৎসা করিতেন না। কোন বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। তর্ক-বিতর্কে বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অহঙ্কার বা গর্বের লেশমাত্রও তাঁহার ভিতর ছিল না। প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথা ব্যতীত একটি বৃথা কথাও বলিতেন না। মেহমান ও অতিথিগণের যথাসাধ্য খেদমত করিতেন। কাহারও বে-তমিযিকে তিনি সহ্য করিতেন না। কাহাকেও তাঁহার তারিফ বা প্রশংসা করিতে দিতেন না।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোবারক আদত-আখ্‌লাক সম্পর্কে বহু কিছু লিখিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইল, ইহার উপর বা-আমল হইতে পারিলেও যথেষ্ট।

আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হযরত হাওয়া (আঃ)

বিবি হাওয়া (আঃ) আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং মানব জাতির মাতা। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরতে বিবি হাওয়াকে আদি পিতা আদমের (আঃ) বাম পাঁজরের হাড্ডি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান হইয়াছিল বেহেশ্‌তের বাগিচা। সেখানে একটি বৃক্ষের ফল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহারা উক্ত ফল ভক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এই নাফরমানীর দরুন এই মরজগতে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কান্দাকাটি করিতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নেহায়েত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে মার্জনা করেন। দুনিয়াতে আসার সময় তাঁহারা একে অপর হইতে নিখোঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় আল্লাহ্‌র কৃপায় তাঁহারা একত্রে মিলিত হন। ইহার পর তাঁহাদের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়।

শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ হইয়া গেলে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটা করা চাই ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া মাফ করিতে পারেন। এখান হইতে আমরা প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাই।

হযরত সারা (আঃ)

বিবি সারা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-স্ত্রী এবং হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা। ফেরেশ্‌তাগণ হযরত সারাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।" তাঁহার ঐশীপ্রেম ও দো'আ কবূল হওয়ার কথা কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে—একদা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) শামদেশে হিজরত করিতেছিলেন। বিবি সারা ছিলেন তাঁহার সঙ্গীনী। তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে এক যালেম বাদশাহের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। এক নাদান গোপনে বাদশাহ্‌কে জানাইল যে, আপনার রাজ্যে এক সুন্দরী রমণী আগমন করিয়াছে। ঘটনাচক্রে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার সঙ্গী রমণীটি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ সে আমার ভগ্নী। (হযরত ইব্‌রাহীম [আঃ] এখানে বিবি সারাকে স্বীয় স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, যেহেতু ইব্‌রাহীম [আঃ]-কে স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলে যালেম বাদশাহ্ তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।) বাদশাহের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া ইব্‌রাহীম (আঃ) বিবি সারাকে বলিলেনঃ দেখ তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিও না। যেহেতু দীনী সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নীই হও। ইহার পর বাদশাহ্ বিবি সারাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহের মতলব মোটেই ভাল নয়। তাই তিনি ওযূ করিয়া নামায পড়িলেন এবং দো'আর জন্য দরবারে এলাহীতে হাত উঠাইলেন। প্রার্থনা জানাইলেন, আয় আল্লাহ্! হে পরওয়ারদেগার বেনিয়ায! সত্য সত্যই আমি যদি তোমার প্রেরিত পয়গম্বরের উপর বিশ্বাসী হইয়া থাকি, ঈমান আনিয়া থাকি এবং অদ্যাবধি আমার সতীত্বকে বজায়

রাখিয়া থাকি, তবে এই যালেম বাদশাহ্‌কে আমার উপর গালেব করিয়া দিও না। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই যালেম বাদশাহ্‌র হাত, পা, এমন-কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনি পঙ্গু হইয়া পড়িল যে, অত্যাচার যুলুম তো দূরের কথা, সে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। বিবি সারা ভাবিলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্‌ মারা যায়, তবে জনগণ অবশ্যই বলিবে যে, এই রমণীই বাদশাহ্‌র হত্যাকারিণী। তাই তিনি (সারা) বাদশাহের নিমিত্ত নেক (খায়রের) দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হইয়া গেল। পুনরায় বাদশাহের মাথায় বদ খেয়াল চাপিল। বাধ্য হইয়া বিবি সারা আবার বদ দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বাবস্থাই ঘটিল। এইবার বাদশাহ্‌ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া খুব কান্নাকাটা করিতে লাগিল। বিবি সারার দয়ার দরিয়ায় বান ডাকিল। তিনি দো'আ করিলেন, বাদশাহ্‌ ভাল হইয়া গেল। এইরূপে সে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবারই তাহা ভঙ্গ করিল। অবশেষে বাদশাহ্‌ বলিয়া ফেলিল—আপনি এখানে কি মুছিবত নিয়া আসিয়াছেন, আপনি দয়া করিয়া এখান হইতে বিদায় হউন। বাদশাহ্‌ পূর্বাহ্নেই বিবি হাজেরাকে বাঁদী বানাইয়া রাখিয়াছিল। এবার তাঁহাকে খেদমতের নিমিত্ত বিবি সারার হাওলা করিয়া দিল। বিবি হাজেরার ইজ্জত আবরু আল্লাহ্‌ তা'আলা হেফাযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবি সারা তাঁহাকে স্বীয় স্বামী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নামাযের পরের দো'আ কবূল হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত কোন মুছিবতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে খাঁটি দেলে তওবা করিয়া নফল নামায আদায় করত দো'আয় মশগুল হওয়া।

হযরত হাজেরা (আঃ)

বিবি হাজেরা হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণী ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। এই সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা হইলঃ তিনি হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিগণের মাধ্যমে দিগন্ত বিস্তৃত মরুময় মক্কাভূমিকে বস্তিতে পরিণত করিবেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হযরত ইব্‌রাহীমকে হুকুম করিলেন বিবি হাজেরা ও তাঁহার দুধের সন্তানকে ভয়াবহ মরু ময়দানে ছাড়িয়া আসিতে। হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ছাড়িয়া আসিলেন বিবি হাজেরাকে তাঁহার দুধের সন্তানসহ নির্জন মরু-ময়দানে। রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের জন্য এক মশক পানি ও এক থলি খোরমা। আসিবার সময় বিবি হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ওহে খালীলুল্লাহ্‌! আমার প্রাণের স্বামী, আমাদিগকে একাকী কোথায় ছাড়িয়া যাইতেছেন? উত্তরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিরুত্তর রহিলেন। বিবি হাজেরা কাতর স্বরে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তবে ইহা কি আল্লাহ্‌র আদেশ? খালীলুল্লাহ্‌ বলিলেনঃ হাঁ! এইবার সহাস্যে উৎফুল্ল হৃদয়ে বিবি হাজেরা বলিয়া উঠিলেন, তবে আর কি চাই? করুণাময়ের আদেশ; তাই আর কোন চিন্তা নাই; তিনি নিশ্চয়ই নিখিল মানবের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর বিবি হাজেরা সেখানে প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খোরমা খাইয়া পানি পান করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ছেলেকে স্তনের দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। অবশেষে এমন একদিন উপস্থিত হইল যখন খোরমা ও পানি সবই ফুরাইয়া গেল। স্তনও দুগ্ধহীন হইয়া পড়িল। উভয়ের ক্ষুধা ও পিপাসা চরমে পৌঁছিল। পিপাসার তাড়নায় মরুভূমির উত্তাপে দুধের শিশু ছট্‌ফট্‌ করিতে

লাগিল। মা ও ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। পানির সন্ধানে মাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ছাফা পাহাড়ে চড়িয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড় পানে দৌড়িয়া ছুটিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও একবিন্দু পানির সন্ধান পাইলেন না। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নীচা ছিল। যতক্ষণ সমভূমিতে চলিতেন, তখন চাতক পাখীর ন্যায় অনিমেষ নেত্রে ছেলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন। কিন্তু নিম্নস্থানে অবতরণ করিলে আর ছেলেকে দেখা যাইত না। তাই তিনি ঐ স্থানটুকু বেগে দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতেন। এইভাবে বিবি হাজেরা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে চড়িয়া কয়েকবার পানির সন্ধান করিলেন। বর্তমানে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিবি হাজেরার এই দৌড়ান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হইল যে, তিনি হাজীদের জন্য উক্ত স্থানে সাতবার দৌড়ান এবাদতে পরিণত করিয়া দিলেন।

অবশেষে বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পুনরায় ঐ আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি, যদি কেহ এমন বিপদের সময় সাহায্য করিতে চায়, তবে আগাইয়া আসিতে পারে। তৎক্ষণাৎ বর্তমান যমযম কূয়ার জায়গায় ফেরেশ্‌তা দেখা গেল। ফেরেশ্‌তা তাঁহার বাজু দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় পানি উথালিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা মাটির বাঁধে পানি আটকাইয়া ফেলিলেন। নিজে পানি পান করিলেন, ছেলেকে পান করাইলেন, মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ফেরেশ্‌তা বলিলেনঃ আপনি চিন্তা করিবেন না। এখানে খোদার ঘর 'খানায়ে কা'বা' রহিয়াছে। এই ছেলেই তাঁহার পিতার সহিত মিলিয়া এই ঘরের মেরামত করিবেন। এই ভয়াবহ নির্জন মরু-ময়দান আবাদী জমিতে পরিণত হইবে। দেখিতে দেখিতে সকলই বাস্তবায়িত হইতে লাগিল। এক মরু কফেলা পানির সন্ধান পাইয়া সেখানে বসিত স্থাপন করিল। যথাসময়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া খানায়ে কা'বা নির্মাণ করিলেন। যমযমের পানি ঐ সময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহা কূয়ার আকার ধারণ করে।

বিবি হাজেরার বিশ্বাস ও ভরসা আল্লাহ্‌র উপর ছিল অপরিমেয়। তাই 'মরুময় ময়দানে অবস্থান করা, আল্লাহ্‌র হুকুম জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে এই ভরসার বদলে কত নেয়ামতই না জাহের হইল। তাঁহার মামুলী দৌড়াদৌড়িই হাজীদের জন্য এবাদতে পরিণত হইয়া গেল। মকবুল বান্দার অতি সাধারণ কার্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার শত শত নযীর ইতিহাসে বিদ্যমান। অতএব, সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্মল আস্থা ও ভরসা রাখা চাই।

হযরত ইসমাঈলের বিবির কাহিনী

খানায়ে কা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ আরও দুইবার মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু একবারও পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। প্রথম বার আসিয়া হযরত ইসমাঈলের বিবিকে বাড়ীতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? উত্তরে বিবি বলিলেনঃ আমরা অত্যন্ত মুছিবতের ভিতর কালযাপন করিতেছি।

অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ আচ্ছা তোমার স্বামী (হযরত ইসমাঈল) বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং ইহাও বলিও যে, তিনি (খালীলুল্লাহ) বলিয়াছেন, আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে। কিছুদিন পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিলেন, বিবির নিকট হইতে বিস্তারিত খবর অবগত হইলেন।

অতঃপর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেনঃ উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং চৌকাঠ তুমি নিজে। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ করি। ইহার পর হযরত ইসমাঈল এই বিবিকে তালাক দিয়া অন্য এক বিবাহ করিলেন।

নব-বধূকে বাড়ী রাখিয়া তিনি পুনরায় বিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আগমন করিলেন। নব-বধূকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? বিবি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমরা সুখেই কালযাপন করিতেছি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম তাহার জন্য দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও, ইহাও বলিও যে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ ঠিকই রাখে। অল্পদিন পরেই হযরত ইসমাঈল বাড়ী আসিলেন এবং যাবতীয় বিষয় অবগত হইলেন। তৎপর বলিলেন, উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং উক্ত চৌকাঠ তুমি নিজেই। অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন, তোমাকে আমার নিকট রাখিতে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, প্রথমা বিবির না-শুকরির কারণে এক নবীর অসন্তুষ্টির দরুন অন্য নবী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়া বিবি শুকরগোযার হওয়ার পরিণামে এক নবীর সন্তুষ্টি ও দো'আর বরকতে অন্য নবী তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখা মোনাসেব মনে করিলেন। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য সহকারে রাযী থাকিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোযার হওয়া। ইহাই অতি উত্তম পন্থা।

বাদশাহ্ নমরুদের কন্যা

যে নমরুদ হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার এক কন্যার নাম রেয়'যা। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। শত শত লোক উহা দেখিবার জন্য ভিড় করিল। নমরুদের কন্যাও একটি উঁচুস্থানে চড়িয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে দেখিল, এই ভীষণ প্রজ্বলিত অগ্নি হযরত ইব্‌রাহীমের লোমও স্পর্শ করিতেছে না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ ওহে ইব্‌রাহীম! তোমাকে অগ্নি কেন জ্বালাইতেছে না? উত্তরে খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ ঈমানের বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তখন রেয়'যা বলিয়া উঠিলঃ আপনার অনুমতি পাইলে এক্ষুণি আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্' বলিয়া এখানে চলিয়া আস। তৎক্ষণাৎ সে কলেমা পড়িয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল, অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। রেয়'যা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবা নমরুদকে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নমরুদ তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন করিল। কিন্তু সকল উৎপীড়ন নির্যাতন তাঁহার অটল ঈমানের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নমরুদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু তাহার আদরণীয় মেয়েকেও সে হারাইল। সুবহানাল্লাহ্! কত নির্ভীক সাহসী মেয়েটি। অকথ্য নির্যাতন, অসহনীয় উৎপীড়ন

সকলই পরাভূত হইল তাঁহার ঈমানের সামনে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এহেন বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ হওয়া যাহার নিকট শত বাধা-বিপত্তি পদদলিত নিষ্পেষিত হয় অনায়াসে।

আইয়ূব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা

বিবি রহীমা নবী আইয়ূব (আঃ)-এর বিবি। একদা নবীর তামাম দেহ দুর্গন্ধময় ঘায়ের দরুন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। তখন সমস্ত চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী নবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংকটকালেও বিবি রহীমা স্বামীকে ছাড়িয়া যান নাই। সর্বদা স্বামীর খেদমতে মশগুল থাকেন। ঘটনাচক্রে একবার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইহার মূলেও ছিল ইবলিসের কারসাজি। ইবলীস্ মানুষের আকৃতিতে আসিয়া আইয়ূব নবীর নিকট মিথ্যা তোহ্মত লাগাইয়াছিল। ফলে নবী রাগান্বিত হইয়া কসম খাইয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবি রহীমাকে একশত দোর্রা মারিবেন। অতঃপর নবী সুস্থ হইয়া উক্ত ওয়াদা পুরা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযেল করিলেন, হে নবী! আপনি শত শলা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু লইয়া তাঁহাকে মাত্র একবার প্রহার করুন, তবেই আপনার কসম পুরা হইবে।

হযরত বিবি রহীমা নারী জাতির আদর্শ। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীকা। নবীর ভীষণ বিপদের সময় যখন সকল বাঁদী-দাসী তাঁহার সাহচর্য ত্যাগ করিল, অন্যান্য বিবিগণ নবীকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তে বিবি রহীমা স্বামীর সেবায় নিমগ্না রহিলেন। এই নির্মল স্বামী-ভক্তি, খেদমত ও ছবর এখ্তেয়ার করার দরুন বিবি রহীমাকে ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া নিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁহার সুপারিশ কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের অন্ধ চোখের উপর ঢালিয়া দিবার জন্য তাঁহার একখানা জামা ভ্রাতাগণের নিকট অর্পণ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস্-সালামকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।) আরও বলিলেন, তাহাদিগকে সপরিবারে তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতে।

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাগণকে বিদায় করিলেন। উক্ত জামার বরকতে পিতা ইয়াকুবের অন্ধ চক্ষু ভাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই সপরিবারে মিসরে পৌঁছিয়া হযরত ইউসুফের সহিত মিলিত হইলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহার খালাকে সম্মানার্থে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মানার্থে সজ্দা করিল। সেই জমানায় সালামের পরিবর্তে সজ্দার প্রচলন ছিল। এই যমানায় সজ্দা করা না জায়েয—বিলকুল হারাম। ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার এন্তেকাল হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার খালাকে বিবাহ করেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, তিনিই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এবং তাঁহার নাম রাহেলা। ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনাই আমার বাল্যকালীন খাবের তাবির। তিনি খাবে দেখিয়া-ছিলেন, চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁহাকে সজ্দা করিতেছে।

এখানে চিন্তার খোরাক ইহাই যে অবলা একজন নারী তিনিও কত বড় বোযুর্গী হাছেল করিয়াছিলেন। এত বড় একজন পয়গম্বরও তাঁহাকে শান-শওকতের সহিত অভিনন্দিত করিলেন, সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা

তাঁহার মোবারক নাম ইউখান্দ। সেই যমানার পণ্ডিতগণ ফেরআউনকে আতঙ্কিত করিয়াছিল যে, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে এক ছেলের জন্ম হইবে। আর সেই ছেলেই তোমার এই সোনার বাদশাহী ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফেরআউনকে ভীষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে সমস্ত রাজকীয় লোকদের হুকুম করিল, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমের ছেলে সন্তানদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলিতে। হুকুম পালনার্থে বনি-ইস্‌রায়ীলের হাজার হাজার মাছুম ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হইল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কালের পর কাল, দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোন সন্তানকেই এই চরম নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঠিক এই ভয়াবহ মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম নিলেন বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে। হযরত মূসার মাতার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে এল্‌হাম হইলঃ তুমি নিশ্চিন্তে ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে থাক। যখন আশংকা হয় যে, ছেলের জন্ম সংবাদ শীঘ্রই প্রচার হইয়া যাইবে, ফলে ফেরআউনের লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, তখন তুমি ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দিও। ইহার পর ছেলেকে পুনরায় তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে রহিল। একদিন সত্য সত্যই মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া অসীম অতল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। অবশেষে দেখা গেল, আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় ওয়াদা যথাযথ পুরা করিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য ইহাই যে, অবলা একজন নারী—কিন্তু তাঁহার ঐশীপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস কত প্রবল! আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষার্থ সদ্যপ্রসূত দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ বিশাল সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাও বান্দার কৃতকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী

মূসা (আঃ)-এর ভগ্নীর নাম নিয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে মরইয়ম—আবার কাহারো মতে কুলসুম। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পাইয়া হযরত মূসার মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরইয়মকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুক ভাসিয়া কোথায় যায়, অবশেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

সিন্দুকটি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে যালেম বাদশাহ্ ফেরআউনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ফেরআউনের লোকেরা কৌতূহলী মনে সিন্দুক উঠাইয়া খুলিয়া ফেলিল। উহাতে তাহারা সুন্দর ফুট্‌ফুটে সোনালী চেহারার এক ছেলে দেখিতে পাইল। ছেলেটিকে নিয়া তাহারা ফেরআউনের সামনে হাজির করিল। নিষ্ঠুর যালেম ফেরআউন ছেলেটিকে কতল করার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল। কিন্তু ফেরআউনের নেকবখত বিবি ছেলেকে কতল করিতে দিলেন না। তাঁহার মাতৃ সুলভ সস্নেহে ছেলেকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া ফেরআউনও রাজী হইয়া গেল। কিন্তু ছেলেকে দুধ পান করানোর দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ছেলে কাহারো স্তন্য পান করিতে চাহে না। সকলেই এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া

পড়িল। সকলেই মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল কি করা যায়? এই সময় মরইয়ম (মূসার ভগ্নী) তথায় উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁহার মাথায় এক চূড়ান্ত বুদ্ধি হাজির হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন দুধ-মায়ের সন্ধান দিতে পারি, যাঁহার দুধ অতি উত্তম এবং তিনি সন্তান পালনেও বিশেষ পারদর্শী। এই বলিয়া তিনি মূসা (আঃ)-এর মাতার নাম বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। ছেলে তাঁহারই দুধ পান করিতে লাগিল। অতঃপর ছেলের লালন-পালন মূসা (আঃ)-এর মাতার উপরই অর্পণ করা হইল। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পূর্বকৃত ওয়াদা পুরা করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। তাই তিনি অতি সুষ্ঠু কৌশলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে অত্যন্ত নিরাপদে ছেলের দুধ-মার স্থলে প্রকৃত মাতাকেই নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। দুশমনেরা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কিছু টের পাইল না। অতএব, দেখা যাইতেছে আক্বল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। আর সুবুদ্ধি বলে কাজ করিতে পারিলে উহার পরিণাম অতি উত্তম।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা

বিবি ছফুরা হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। একবার হযরত মূসার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিসর শহরের এক যালেম কাফের মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ফেরআউনের নিকট পৌঁছিল। ফেরআউন হুকুম করিল মূসা (আঃ)-কে কতল করিবার জন্য। হযরত মূসা ইহা জানিতে পারিয়া গোপনে 'মাদায়েন' শহরে রওয়ানা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে একটি কূপের নিকটবর্তী হইলেন। দেখিলেন, বহু সংখ্যক রাখাল কূপ হইতে পানি উঠাইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন বকরীদলকে পানি পান করাইতেছে। আর কূপ হইতে অনতিদূরেই দুইটি মেয়ে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভিড়ের জন্য তাহারা কূপের নিকটেই আসিতে পারিতেছে না। মূসা (আঃ) তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, 'আমাদের গৃহস্থালী কার্য করিবার মত কোন পুরুষ লোক নাই। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য করিতে হয়। যেহেতু আমরা মেয়ে মানুষ; তাই অপেক্ষা করিতেছি—পুরুষগণ চলিয়া গেলে পর আমরা আমাদের বকরীদলকে পানি পান করাইব।'

মেয়ে দুইটির এই দুর্দশা দেখিয়া মূসা (আঃ)-এর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কূপ হইতে পানি উঠাইয়া তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পর মেয়ে দুইটি এই ঘটনা পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। তাঁহাদের পিতা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বড় মেয়েকে বলিলেন, মূসা (আঃ)-কে ডাকিবার জন্য। পিতার আদেশে বড় মেয়েটি লজ্জাবনতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। হযরত মূসা (আঃ) খবর পাইয়া হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি হযরত মূসার ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাবা! এখন তুমি যালেম বাদশার রাজ্যের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছ। এখন সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আর আমি আমার এই মেয়ের যে-কোন একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। কিন্তু শর্ত থাকিবে যে, আট কিম্বা দশ বৎসর পর্যন্ত তুমি আমার বকরী চরাইবে। ইহাতে হযরত মূসা (আঃ) রাজী হইয়া গেলেন।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় কন্যার সহিত হযরত মূসার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বিবিকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রবল শীত অনুভূত হওয়ায়

তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজন মনে করিলেন। দূর হইতে তূর পাহাড়ে অগ্নি দেখিতে পাইলেন। নিকটবর্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা অগ্নি নহে—আল্লাহ্‌র নূর। এইখান হইতেই তিনি নুবুওত লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন নবীর মেয়ে হইয়া তাঁহারা স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য করিত অথচ তাঁহাদের যথার্থ মেয়েলী লজ্জা শরম বাকী রাখিত। এই যমানায় পর্দা-পুশিদার হুকুম যেমনি কঠোর, গৃহস্থালী কার্য করার প্রয়োজনও তেমনি অধিক। কিন্তু হালে দেখা যায় নারিগণ গৃহস্থালী কার্যে যেমনি অলস, ঠিক তেমনি নিস্তেজ। পক্ষান্তরে বে-পর্দা, বেহায়া ও নির্লজ্জতার কার্যে বেশ তৎপর। ইহা কিয়ামতের আলামত বৈ কি?

হযরত বিবি আছিয়া

খোদায়ী দাবীদার ফেরআউনের বিবি ছিলেন হযরত আছিয়া। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নেশানা বে-এন্তেহা। ফেরআউন শয়তান, আর তাহারই বিবি অলীআল্লাহ্। হযরত আছিয়ার প্রশংসা কোরআন পাকে করা হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু আওরতদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন পূর্ণ কামালিয়াত হাছেল করিয়াছে—বিবি মরইয়ম ও বিবি আছিয়া। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বিবি আছিয়াই হযরত মূসাকে বাল্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। হযরত মূসাকে লালন-পালন করিবারকালেই তাঁহার মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

পূর্ণ বয়সে হযরত মূসা (আঃ) নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। এই খবর বিবি আছিয়ার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। বিবি আছিয়ার ঈমান আনার সংবাদ ঘটনাচক্রে ফেরআউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরআউন সংবাদ পাইয়া দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইল। অবশেষে সে হযরত আছিয়ার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইল। সেই অসহ্য যাতনায়ই বিবি আছিয়া ইহদুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তবুও আল্লাহ্‌র বিশ্বাসে ঐশী প্রেমের অচল-অটল রহিলেন।

ঈমান অতুলনীয় অমূল্য স্বর্গীয় বস্তু। হযরত আছিয়া কেমন অটল ঈমানের অধিকারিণী তাহা অনুধাবনীয়। ফেরআউন মিসরাধিপতি। বিবি আছিয়া তাহারই প্রিয়তমা মহিষী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফেরআউন অজস্র ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দিত। তথাপি ঈমানের ব্যাপারে আসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে একদণ্ডও ভাবিলেন না। মিসরাধিপতি স্বামীকে ভুলিলেন, সমস্ত আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণ দিলেন, তবু ঈমান ছাড়িলেন না। প্রত্যেক আদর্শ মুসলমানের ইহাই পরিচয়।

ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী

ফেরআউন-কন্যার ছিল এক বাঁদী। তাহার যাবতীয় খেদমতের ভার উক্ত বাঁদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সে গোপনে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসার উপর ঈমান রাখিত। ফেরআউনের ভয়ে সে তাহা কখনো প্রকাশ করিত না। একদা সে শাহজাদীর চুল আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় তাহার হাত হইতে চিরুণী মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটি হইতে উহা উঠাইবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলিল। শাহজাদী ইহা শুনিয়া চমকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ তুই কি বলিলি, ইহা কাহার নাম? উত্তরে বাঁদী বলিলঃ আমি তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছি যিনি এই নিখিলের স্রষ্টা। তোমার পিতার সৃষ্টিকর্তা এবং বাদশাহীদাতা। বাদশাহ্‌জাদী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতার চেয়েও কি কেহ বড় আছেন?

অতঃপর শাহজাদী দৌড়াইয়া গিয়া পিতা ফেরআউনের নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। ফেরআউন বাঁদীকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাঁদী নির্ভয়ে ফেরআউনের সামনে হাজির হইল। ফেরআউন তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। তাঁহাকে ভয় দেখাইল, গালিগালাজ করিল। বাঁদী হাসি-মুখে বলিয়া দিলঃ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, আমি কিছুতেই ঈমান ত্যাগ করিব না। ইহাতে বাঁদীর উপর অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ করা হইল। কিন্তু সে ঈমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। তারপর তাহার কোলের শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষপ করা হইল। শিশুটি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় বলিয়া গেল—আম্মা, ইমান নষ্ট করিবেন না। ইহার পর বাঁদীকে হাত বাঁধিয়া অগ্নিতে ফেলান হইল। সে জান দিল, কলিজার টুক্‌রা শিশুকে হারাইল, তবু ঈমানের মায়া ছাড়িল না।

এহেন ঘটনা হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। মোটকথা, ঈমান অমূল্য রত্ন। শতবাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, জান কোরবান দিয়াও ইমানকে রক্ষা করা চাই। ইহাই মুসলমানের একমাত্র সম্বল।

হযরত মূসার এক বৃদ্ধা লস্কর

মিসরাধিপতি ফেরআউন খোদায়ী দাবী করিল। যাহারা তাহাকে খোদা বলিয়া মানিল তাহারা নিশ্চিন্ত রহিল। আর যাহারা মানিল না সে তাহাদের উপর অসহনীয় উৎপীড়ন নির্যাতন চালাইল। ফলে, খোদা-বিশ্বাসী হযরত মূসা নবীর অনুসারীদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। শেষে একদিন হযরত মূসা বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইলেন। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়া দেশ ত্যাগ করিতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম আর কাল বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গী সাথী, ভক্তবৃন্দ সকলকে লইয়া তিনি অচেনা পথের যাত্রী হইলেন। পথ চলিতে চলিতে লোহিত সাগর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখন দরিয়া পার হওয়ার ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে মূসা আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কে আছ, যে ইহার ভেদ আমাকে বলিতে পার? এক বৃদ্ধা হাজির হইয়া বলিতে লাগিলঃ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় এন্তেকালের সময় তাঁহার বংশধরগণকে বলিয়াছিলেনঃ যদি তোমরা কোন সময় মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া যাও, তবে আমার কবরকেও তোমাদের সহিত লইয়া যাইও, নচেৎ তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। মূসা আলাইহিস্‌সালাম বৃদ্ধাকে কবরের স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বলিলঃ হে নবী! আপনি আমাকে একটি স্বীকারুক্তি প্রদান করিলেই আমি কবরের সন্ধান দান করিব। মূসা (আঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার সেই স্বীকারুক্তি কি? বৃদ্ধা আরয করিলঃ আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হউক এবং বেহেশ্‌তে আপনার নিকট আমার স্থানলাভ ঘটুক। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিলেনঃ এলাহী! এই ব্যাপারে আমার তো কোন কিছু করিবার নাই। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আশ্বাস বাণী আসিল, হে মূসা! আপনি স্বীকার করুন; আমি উহা পূর্ণ করিব। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) বৃদ্ধাকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইলেন! বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া কবরের ঠিকানা বলিয়া দিল। উহা দরিয়ার মাঝখানে ছিল। কবর বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও মিলিয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল, এই বৃদ্ধা কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এখানে দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদের লোভ করিলেন না। তিনি সবকিছু ভুলিয়া চাহিলেন আখেরাতের উন্নতি ও শান্তি। যেহেতু দুনিয়ার আরাম আয়েশ নছিব পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে মিলিয়া যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের দুনিয়ার লোভ-লালসা জলাঞ্জলি দিয়া চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় আলমে আখেরাতের উন্নতি বিধান ও শান্তি কামনা করাই মুসলমানের কাজ।

হাইসূরের ভগ্নী

কোরআন শরীফে হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে খিযির (আঃ) এক ছোট শিশুকে মারিয়া ফেলেন। হযরত মূসা (আঃ) পেরেশান হইয়া খিযির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এই নিষ্পাপ শিশুটি কি অন্যায় করিল, যদ্দরুন আপনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন? উত্তরে হযরত খিযির (আঃ) বলিলেন, এই শিশুটি বয়স্ক হইলে কাফের হইত। তাহার মা-বাপ উভয়েই ঈমানদার লোক। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের মহব্বতে পড়িয়া ঐ ঈমানদার মা-বাপেরও কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এই শিশুকে হত্যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এখন উক্ত ছেলের পরিবর্তে এক মেয়ে দান করিবেন। সে হইবে সকল খারাবী হইতে পাক-পবিত্র এবং মা-বাপের জন্য মঙ্গলজনক। এই সম্পর্কে অনেক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, উক্ত মা-বাপের ঘরেই এক মেয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এক পয়গাম্বরের সহিত এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন হইয়াছিলেন পয়গাম্বর। উক্ত ছেলের নাম ছিল হাইসূর। আর এই নেক্‌কার মেয়ে ছিলেন হাইসূরেরই ভগ্নী।

সোবহানাল্লাহ্! মেয়েটি কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। যাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন পয়গাম্বর হইয়াছিলেন। আর তাঁহার তারিফ কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের কর্তব্য যাবতীয় গোনাহের কাজ হইতে পরহেয করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দি হাছেল করিয়া ইহজীবন ও পরজীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

হযরত বিলকিস

বিলকিস ছিলেন 'সাবা' রাজ্যের বাদশাহ্। হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এক হুদহুদ জানোয়ার খবর দিল, সে এক স্ত্রী বাদশাহ্‌কে দেখিয়াছে যে, সে সূর্য পূজা করিয়া থাকে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) উক্ত স্ত্রী বাদশাহ্‌র নিকট পত্র লিখিলেন। উক্ত জানোয়ারের মারফতই তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল, তোমরা অনায়াসে মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

যথাসময়ে বাদশাহ্‌র নিকট পত্র পৌঁছিল। পত্র পাইয়া বাদশাহ্ উজির সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে বাদশাহ্ স্থির করিল, প্রথমতঃ তাঁহার খেদমতে যৌতুক উপঢৌকন পেশ করা হউক। উপঢৌকন গ্রহণ করিলে বুঝিব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ্, অন্যথায় বুঝা যাইবে তিনি সত্য পয়গাম্বর। যথসময়ে উপঢৌকন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন না এবং জানাইয়া দিলেনঃ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবূল না করিলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব।

এই সংবাদ যখন হযরত বিলকিসের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী আল্লাহ্‌র সত্য পয়গাম্বরের উক্তি। অতঃপর তিনি ইস্‌লাম

কবুল করিবার জন্য স্বীয় শহর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত বিলকিসের শাহী-তখ্‌তখানি তাহার দরবারে আনিয়া রাখিলেন। শাহীতখ্‌তের মোতী ও জওহরসমূহ উঠাইয়া অন্যভাবে লাগান হইল।

এদিকে হযরত বিলকিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোলায়মান (আঃ) তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখ তো, (বিলকিসের সিংহাসনের প্রতি ইশারা করিয়া) ইহা কাহার সিংহাসন? বিলকিস উত্তর করিলেনঃ ইহা তো আমার বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ছুরত সামান্য পরিবর্তিত দেখা যায়। ইহাতে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় খোদা-প্রদত্ত শাহী-তখ্‌তের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি পানিপূর্ণ হাউযে কাঁচের ফরস বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) হাউযের অপর পারে গিয়া বসিলেন। যেখানে যাইতে হাউয অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। তিনি বিলকিসকে তথায় আগমন করিতে বলিলেন। বিলকিস হাউযের কিনারায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। যেহেতু হাউযের উপর কাঁচ নজরে আসিতেছিল না। অবশেষে যখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হাউযের উপর কাঁচের ফরস বিছান হইয়াছে, তখন তিনি নির্বিঘ্নে উহার উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামান্য দুইটি মোজেযা দেখার পরই তাহার মাথা হইতে সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার বিদায় হইল। আনত মস্তকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকা বশতঃই তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকের মতে তিনি সমগ্র জাহানের বাদশাহ্ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিলেন।

বনি-ইস্রায়ীলের এক দাসী

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, বনি-ইস্রায়ীল কওমের একজন স্ত্রীলোক এক শিশুকে দুধ পান করাইতেছিল। এই সময় বহু শান-শওকতের সহিত এক আরোহী ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। আরোহীকে দেখিয়া মা দো'আ করিল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেকে এই রকম বড় শান-শওকতদার বানাইয়া দাও। ইহা শুনিয়া ছেলে স্তন্য পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহ্ আমাকে এইরূপ বানাইও না।

কিছুক্ষণ পর একদল লোক এক বাঁদীকে চোর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মা বলিল, আল্লাহ্ আমার ছেলেকে এমন বানাইও না। ছেলে দুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ ইহা আল্লাহ্! আমাকে এমনই বানাইয়া দাও।

ছেলের মা ছেলের কথার কোন ভেদ খুঁজিয়া পাইল না। ছেলেকে ধমকি দিয়া বলিয়া উঠিলঃ এ কেমন কথা! উত্তরে ছেলে বলিল, উক্ত আরোহী একজন অত্যাচারী যালেম। আর এই বাঁদী নির্দোষ মযলুম। আল্লাহ মযলুমের সাহায্যকারী দোস্ত।

বিষয়টি বড়ই প্রণিধানযোগ্য। উক্ত আরোহী সাধারণ সমক্ষে সম্মানের পাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঘৃণেয় ও নিকৃষ্ট। আর এই বাঁদী সাধারণ সমক্ষে অপমানিত লাঞ্ছিত, কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল ও সম্মানিত। সাধারণতঃ গরীব দুর্বলের উপর সামান্য সন্দেহ করিয়াই যা-তা ব্যবহার করা হয়। অথচ তাহা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ সে নির্দোষ, আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দা।

বনি-ইস্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী

মুহাম্মদ ইব্‌নে-কা'র হইতে বর্ণিত, বনি-ইস্রায়ীল কওমে এক ব্যক্তি বড় আলেম ও আবেদ ছিলেন। বিবির সঙ্গে তাহার খুব মহব্বত ছিল। একদা আকস্মিকভাবে বিবির মৃত্যু হইল। ইহাতে স্বামীর মনে এত কষ্ট হইল যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িলেন। জনগণের সহিত মেলা-মেশা ত্যাগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন মেয়েলোক তাহার নিকট হাজির হইল। সে বাড়ীর অপরাপর লোকদের নিকট আরয করিল যে, আমি আলেম ছাহেবের নিকট একটি মাসআলা জানিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে আলেম ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

আলেমের সম্মুখীন হইয়া স্ত্রীলোকটি আরয করিলঃ হুযূর! আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া নিয়া বহুদিন যাবৎ উহা পরিয়া আসিতেছি। এখন সে উহা ফেরত নিতে চাহে। উহা কি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে? আলেম ব্যক্তি বলিলেনঃ বেশক, উহা ফেরত দিতে হইবে। স্ত্রীলোকিট বলিলঃ আমি তো উহা এক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখন উহা কিরূপে ফেরত দিব? ইহাতে আলেম বলিলেনঃ এখন তো উহা আরও সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত; যেহেতু এত দিন সে রেয়াআত করিয়া তোমার নিকট রাখিয়াছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি আলেমকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি জিনিস আপনার নিকট এত দিন রাখিয়াছিলেন, এখন নিয়া গেলেন। সে-জন্য চিন্তা করিবার কি আছে? ইহাতে আলেমের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহার আর চিন্তা রহিল না। আওরতের নীতিবাক্যে তিনি বড়ই উপকৃত হইলেন। সকলেই আওরতের বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

হযরত বিবি মরইয়ম

বিবি মরইয়মের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা মান্নত করিয়াছিলেন—তাহার পেটের সন্তানকে তিনি মস্‌জিদের খেদমতের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পর হযরত মরইয়মের জন্ম হইল। তাঁহার মাতা স্বীয় মান্নত পুরা করিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দেসে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বুযুর্গগণের নিকট আরয করিলেনঃ এই মেয়েটি মান্নতের, ইহাকে রাখুন।

সকলেই মেয়েটির অপূর্ব আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেয়েটির লালন-পালন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তন্মধ্যে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-ও ছিলেন। তিনি সম্পর্কে বিবি মরইয়মের খালু হইতেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল মেয়ের লালন-পালন করিবেন হযরত যাকারিয়া (আঃ)। অল্পদিনেই যথাযথ আদর যত্নে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শেয়ানা হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মকে কোরআন পাকে 'ওলী' ফরমাইয়াছেন। অনেক সময় গায়েব হইতে তাঁহার নিকট সুস্বাদু ফল-মূল আসিত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্‌সালাম এইসব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিতেনঃ এই সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। মোটকথা, বিবি মরইয়মের তামাম জেন্দেগীই অলৌকিক। এমনকি পরিণত বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতেই গর্ভবতী হন বিনা স্বামীতে। আর এই সন্তানই হইলেন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম।

বিনা স্বামীতে সন্তান লাভ হওয়ায় জন-সাধারণ সতী সাধ্বী বিবি মরইয়মকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। নানা জনে নানা তোহ্‌মত লাগাইতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মের সন্তান হযরত ঈসা (আঃ)-কে জন্মের পরক্ষণেই কথা কহিবার শক্তি দান করেন। সদ্য-প্রসূত শিশুর মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার বিনা বাপে জন্ম হওয়া, একমাত্র সর্বশক্তিমানের অসীম কুদরত। বস্তুতঃ বিবি মরইয়ম নির্দোষ নিষ্কলুষ সতী নারী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হুযূরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে মাত্র দুইজন কামেল বুযুর্গ আছেন একজন বিবি মরইয়ম, অন্যজন বিবি আছিয়া।

হযরত খাদিজা

বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী। পঁচিশ বৎসর বয়সে ইতিহাস প্রসিদ্ধা ; সচ্চরিত্রা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা খাদিজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বিবাহ হয়। সকলেই বিবি খাদিজাকে 'তাহেরা' অর্থাৎ পবিত্রা বলিয়া ডাকিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদিজাকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হযরত জিব্রায়ীল আমীন আপনার নিকট সালাম নিয়া আসিয়াছেন। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে চারিজন সর্বশ্রেষ্ঠা ;—(১) হযরত মরইয়ম। (২) হযরত আছিয়া। (৩) হযরত খাদিজা। (৪) হযরত ফাতেমা।

ইস্‌লামের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই সর্বপ্রথম মুসলমান হন বিবি খাদিজা। সেই সময় ইস্‌লাম প্রচার করিতে গিয়া কাফেরদের গালিগালাজ, অত্যাচার-উৎপীড়নে রাসূলুল্লাহ্ যখন পেরেশান হইয়া পড়িতেন, তখন বিবি খাদিজা তাঁহাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দান করিতে সক্ষম হইতেন। বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনি মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন, রাসূলুল্লাহ্‌ও বিবি খাদিজাকে ঠিক তেমনি ভালবাসিতেন।

হযরত সওদা

হযরত সওদা ছিলেন নবী-করীমের বিবিগণের অন্যতমা। তিনি তাঁহার ভাগের বাসর রাত্রিগুলি হযরত আয়েশাকে দিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ একমাত্র হযরত সওদা ব্যতীত অন্য কোন আওরতকে দেখিয়া আমার আগ্রহ জাগে নাই যে, আমি তাহার মত হই। হযরত সওদাকে দেখিলে আমি মনে মনে আরযু করিতাম, আমি যদি তাঁহার মত হইতাম।

আমাদের দেশী কথায় হযরত আয়েশা হযরত সওদার সতীন। হালে এক সতীন অন্য সতীনের সম্পর্ক হয়—সাপ বেজীর সম্পর্ক। আর সামান্য কারণে একে অপরের জানী দুশ্‌মন হইয়া দাঁড়ায়। এখানে দেখা যায়, হযরত সওদা হযরত আয়েশাকে স্বীয় বাসর রাত্রিগুলি দিয়া দিয়াছেন। আর হযরত আয়েশা সাদা দিলে, মুক্ত প্রাণে স্বীয় সতীনের তারিফ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল ইসলামের সনাতন আদর্শ। এই বাস্তব আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সকল মুসলমানেরই সচেতন হওয়া উচিত।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা

হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ্‌র প্রিয়তমা সহধর্মিণী অতি অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিতা হন। তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল তীব্র, অত্যন্ত প্রখর। হযরতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট মাসআলা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার মোবারক আখলাক চরিত্র মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

একদা জনৈক ছাহাবী মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সহিত আপনার বেশী মহব্বত? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আয়েশার সহিত এবং আবু বকরের সহিত।

হযরত আয়েশা নারী জগতের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি নারী হইয়াও কত বড় জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। বড় বড় আলেম ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। মোটকথা, এল্‌ম হাছেল করিতে হইলে আত্মগর্ব ও লজ্জা ত্যাগ করিতে হয়। চাই এল্‌ম বয়োকনিষ্ঠের নিকট থাক বা নারীর নিকট থাক, উহা হাছেল করিতে লজ্জা করা উচিত নয়।

হযরত হাফ্‌সা

নবী করীমের নেক বিবিগণের মধ্যে হাফ্‌সা একজন। একদা কোন কারণে নবী করীম রাগ করিয়া হযরত হাফ্‌সাকে তালাক দেন। তৎক্ষণাৎ জিব্রায়ীল আমিন আসিয়া নবীর নিকট সুপারিশ করিলেন, হে নবী! আপনি হযরত হাফ্‌সার তালাক ফিরাইয়া লউন। যেহেতু তিনি দিনের বেলা রোযা থাকেন এবং রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া নামায আদায় করেন। এছাড়া তিনি দানে মুক্ত হস্ত। হযরত হাফ্‌সা স্বীয় ভাইকে অছিয়ত করিয়া যান, তাঁহার ভূ-সম্পত্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ করিয়া উহার যথাযথ বন্দোবস্ত করিতে।

হযরত হাফ্‌সা একজন খোদাভক্তা, এবাদত প্রিয়া, মুক্তমনা ও দানশীলা নারী ছিলেন। এই সমস্তের বদৌলতেই আল্লাহ্‌ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার তালাক ফিরাইয়া লওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। হযরত হাফ্‌সার ন্যায় দীনদারী এখতেয়ার করা সকলেরই কর্তব্য।

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ নবী করীমের বিবি। হযরত যায়েদ একজন ছাহাবী। নবী করীম তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ বয়স্ক হইলেন। নবী করীম তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। হযরত যয়নবের জন্য তাঁহার ভাইয়ের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন। কিন্তু হযরত যায়েদের হিসাবে তাঁহারা নিজদিগকে খান্দানী মনে করিতেন। তাই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা "ওহী" প্রত্যাদেশ নাযেল করিলেন। "পয়গাম্বরের নির্বাচনের পর কোন মুসলমানের কোন ওযর থাকা উচিত নয়।" ইহার পর উভয়েই এই বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। যথারীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সদভাব দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবী করীম অনেক বুঝাইলেন, নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, বিবাহের পূর্বেই ইহাতে ভাই-বোন অসম্মত ছিল। কেবলমাত্র আমার ইচ্ছার উপর উভয়ে রাযী হইয়াছিল। এখন যদি তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়ের মনে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) স্থির করিলেন, সকল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং হযরত যয়নবকে বিবাহ করিবেন। ইহাতে উভয়েই সান্ত্বনা লাভ করিবে; কিন্তু বেঈমান লোকেরা অবশ্যই তোহ্‌মত লাগাইবে। তাহারা বলিবে যে, নবী স্বীয় পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই হযরত যায়েদ তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

ইদ্দত পুরা হইয়া গেল। নবী করীম স্বয়ং বিবাহের পয়গাম দিলেন। ওযূ করিয়া নামায আদায় করত আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট মুনাজাত করিলেন। আয় আল্লাহ্‌! আমি নিজ বুদ্ধিতে কোন কাজ

করি না, কেবল আপনার আদেশেই করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলের উপর "ওহী" নাযিল করিলেন, "আমি তাঁহার বিবাহ আপনার সহিত করিয়া দিলাম।" রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবকে এই আয়াত শুনাইয়া দিলেন। হযরত যয়নব অন্যান্য বিবিগণের সহিত ফখর করিয়া বলিতেন, দেখ! তোমাদের বিবাহ মা-বাপের দ্বারা হয়, আর আমার বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলা করাইলেন। এই সময় হইতেই নারীদের পর্দার হুকুম জারি হয়। হযরত যয়নব খুব দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত নরম, দয়ায় পরিপূর্ণ।

একবারের এক ঘটনা। হযরতের সকল বিবিগণই মিলিতভাবে হযরতের নিকট আরয করিলেন, আপনার পর কোন্ বিবি সর্ব-প্রথম আপনার সহিত মিলিত হইবেন। উত্তরে হযরত বলিলেন, যাহার হাত অধিক লম্বা। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাত মাপিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল, হযরত সওদার হাত অধিক লম্বা। হযরতের মৃত্যুর পর দেখা গেল, হযরত যয়নব মরিলেন সকলের আগে এবং হযরত সওদা মরিলেন সর্বশেষে। ফলে সকলেই বুঝিলেন, সাখাওতির, এ'তেবারেই (দানের হিসাবে) হাত লম্বা হয়।

হযরত যায়েদ তখন বুঝিতে পারিলেন, হযরত যয়নব হযরতের কত প্রিয়া ছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ আমি হযরত যয়নব হইতে উৎকৃষ্টা কোন আওরত দেখি নাই। নবী করীম (দঃ) বলেনঃ (হযরত) যয়নবের ন্যায় নম্র স্বাভাব এবং আল্লাহ্র সামনে অনুনয়বিনয়কারিণী আওরত আমি দেখি নাই।

হযরত যোয়ায়রিয়াহ

হযরত যোয়ায়রিয়াহ নবী করীম (দঃ)-এর বিবিদের অন্যতমা। বিখ্যাত বনি-মোস্তলকের জেহাদের সময় কাফেরদের শহর হইতে মুসলমানগণের হস্তে বন্দিনী হন। গনিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) বণ্টনের সময় তিনি জনৈক ছাহাবীর হিসসায় পড়েন। অনেকের মতে উক্ত ছাহাবীর নাম ছাহেবত-ইব্নে-কায়েস।

বন্দিনী যোয়ায়রিয়াহ মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি আপনাকে এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিন। ইহাতে ছাহাবী রাযী হইলেন। অতঃপর যোয়ায়রিয়াহ কিছু টাকা সাহায্য পাওয়ার আশায় নবী করীমের নিকট গেলেন। তিনি যোয়ায়রিয়ার দীনদারী, পরহেযগারী ও হোস্নে আখলাক দর্শনে বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রাযী হও, তবে আমি যাবতীয় টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া লইব। ইহাতে তিনি মনেপ্রাণে সম্মতি জানাইলেন। মোটকথা, শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ সংবাদ ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মুসলমানদের হস্তে হযরত যোয়ায়রিয়ার খান্দানের যত লোক বন্দী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করিল। যেহেতু মুসলমানগণ ভাবিলেন, এই খান্দানের সহিত রাসূলুল্লাহ্র আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব, কিছুতেই আর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। তাহাদিগকে গোলাম বানাইয়া রাখিলে বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্র সহিতই বে-আদবী করা হইবে।

হযরত আয়েশা বলেনঃ এমন কোন দীনদার পরহেযগার, মোত্তাকী আওরতের কথা আমার জানা নাই, যাহার দীনদারী ও পরহেযগারীর বদৌলতে স্বগোত্রীয়গণ এত অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছে।

সোবহানাল্লাহ্! দীনদারী পরহেযগারী কত বড় দৌলত। যাহার উছিলায় দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই নাজাত পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাজাত নয়। এই ঘটনা হইতে জানা গেল, সমগ্র কওমও নাজাত পাইতে পারে।

হযরত মায়মুনাহ

হযরত মায়মুনাহ নবী করীমের প্রিয়তমা মহিষী। জনৈক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বলেন, একদা হযরতের নিকট তিনি আরয করেনঃ আমি আপনাকে আমার জান বখশিশ করিলাম অর্থাৎ, বিনা-মহরে আপনার পতিত্ব আমি বরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কবূল করিলেন। বিনা-মহরে বিবাহ—ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌রই বৈশিষ্ট্য।

অপর এক সুপ্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বলেনঃ যে আয়াতে এহেন বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই সময়ই নাযেল হয়। হযরত মায়মুনাহ্‌র প্রথম স্বামীর নাম হাবিতীব।

হযরত মায়মুনাহ কত দীনদার, ঈমানদার আওরত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতকে চরম ও পরম এবাদত জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাসূল (দঃ)-এর সহিত বিনা-মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইতে এমন উদগ্রীবা ছিলেন। হালে মুসলিম কওমে উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে বিবাহের মহর নিয়া এত বাড়াবাড়ি হয় যে, উহা বড়ই দুঃখজনক।

হযরত সফিয়া

হযরত সফিয়া নবী করীমের বিবি। খয়বরের জেহাদে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হন। তিনি এক ছাহাবীর বাঁদীরূপে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তিনি হযরত হারুণ (আঃ)-এর খান্দানের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা হইতে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও সহনশীলতার পরিচয় মিলে।

হযরত সফিয়ার এক বাঁদী একদা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করিল। সে চোগলখুরী করিয়া বলিল, শনিবারের সহিত এখনও তাহার মহব্বত বর্তমান। শনিবার ইহুদীদের নিকট মহা সম্মানিত ও পবিত্র দিন। অর্থাৎ, হযরত সফিয়া এখনও পুরা মুসলমান হন নাই। ইহুদী মযহাবের প্রভাব এখনও তাঁহার উপর বাকী রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখনও ইহুদীদের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সফিয়াকে ডাকাইয়া এইসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত সফিয়া বলিলেনঃ প্রথম কথাটি বিলকুল (ডাহা) মিথ্যা। যেহেতু আমি মুসলমান হইয়াছি। আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবার দিয়াছেন, তাই এখন শনিবারের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আর দ্বিতীয় কথাটি-সত্য। যেহেতু ঐসব লোক আমার আত্মীয় ছিল। তাহাদের সহিত নেক ব্যবহার করা শরীঅত বিরোধী নয়।

অতঃপর বাঁদীকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে মিথ্যা চোগলী খাইতে কে বলিয়াছে? সে উত্তর করিলঃ ইবলীস্ শয়তান। ইহার পর হযরত সফিয়া উক্ত বাঁদীকে আযাদ করিয়া দিলেন। কোন জোর জবরদস্তি বা গালিগালাজ করিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, কোন চাকর-চাকরাণী কোন অন্যায় কাজ করিলে উহা যদি অসহ্য হয়, তবে তাহার উপর জোর যুলুম না করিয়া, গালাগালি না করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

হযরত যয়নব

হযরত যয়নব নবী করীমের আদরণীয়া কন্যা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হযরত আবুল আছ ইবনে-রবি। হযরত যয়নব ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করেন। যেহেতু তাঁহার স্বামী ঐ সময় ইসলাম কবুল করেন নাই। অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামী যখন ইসলাম কবুল করিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন, তখন নবী করীম পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ ইবনে-রবি মদিনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে কাফেরদল কর্তৃক আক্রান্ত হন যাহার ফলে তিনি অল্পদিন পরেই এন্তেকাল করেন।

ইসলাম চির সত্য সনাতন ধর্ম। যেখানে কোন অন্যায় অপবিত্রতার সংশ্রব নাই। নাই কোন আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই। ইহাই শিক্ষা দিলেন হযরত যয়নব নিখিল উম্মতে-মোহাম্মদীকে। নিরীহ অবলা নারী হইয়াও সত্য সনাতন দীনের মহব্বতে নির্মল বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামী ও মাতৃভূমি ছাড়িয়া গেলেন। রিক্ত হস্তে আল্লাহ্ ও রাসূলকে সম্বল করিয়া চলিলেন।

হযরত রোকেয়া

হযরত রোকেয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া কন্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় উৎবা ইবনে আবি-লাহাবের সহিত। যে আবু-লাহাবের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে সূরায়ে তাব্বত ইয়াদার··· মাধ্যমে। তাহারা পিতা-পুত্র কেহই মুসলমান হয় নাই এবং পিতার পরামর্শে পুত্র হযরত রোকেয়াকে ত্যাগ করে।

পরবর্তীকালে হযরত ওস্মান গণীর সহিত হযরত রোকেয়ার বিবাহ হয়। জংগে বদরের সময় হযরত রোকেয়া বিমার ছিলেন। নবী করীম জেহাদে যাওয়ার সময় তাঁহার তিমারদারীর (সেবাশুশ্রূষার) জন্য হযরত ওসমানকে ঘরে রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, তোমরাও মোজাহেদীনদের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও গনিমতের মালের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম যুদ্ধ শেষ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেই হযরত রোকেয়া এন্তেকাল করিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হযরত রোকেয়া কত বড় ধার্মিকা নারী ছিলেন। তাঁহার খেদমত করাতেও জেহাদের সওয়াব হাছেল হইল। ইহা তাঁহার অসীম বুযুর্গীরই নিশানা।

হযরত উম্মে কুলসুম

হযরত উম্মে কুলসুম হযরতের কন্যাগণের অন্যতম। তাঁহার প্রথম শাদী হয় আবু লাহাবের অপর এক পুত্রের সহিত। ইতিমধ্যে নবী করীম নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। হযরত উম্মে কুলসুম ইসলাম কবুল করিলেন কিন্তু আবু-লাহাব বা তাহার পুত্র কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। ফলে হযরত উম্মে কুলসুম পরিত্যাজ্যা হইলেন। হযরত রোকেয়ার এন্তেকাল হইলে হযরত ওসমান গণীর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ধার্মিকা, সরল প্রাণা, নম্র ও বিনয়ী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণ ছিল অসামান্য।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

নবী করীমের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা। কিন্তু মর্তবার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কলিজার টুক্‌রা বলিয়া থাকিতেন। এছাড়া তিনি তাঁহাকে সারা নারী-জাহানের সরদার বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেনঃ যে কথায় মা ফাতেমার প্রাণে কষ্ট হয়, সে কথায় আমার

প্রাণেও কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে বিমারীতে এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন, হযরত ফাতেমাও সেই বিমারীতে এন্তেকাল করিবে। ইহা রাসূলুল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা শুনিয়া হযরত ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মা! চিন্তা করিও না। তোমার জন্য দুইটি সুসংবাদ। প্রথমতঃ, তুমি শীঘ্রই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, বেহেশ্‌তী সকল আওরতের সরদার তুমি হইবে। হযরত আলীর (রাঃ) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হযরত হালিমা সাআদিয়া

হযরত হালিমা সাআদিয়া নবী করীমকে শৈশবে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আদর-যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তায়েফের জেহাদে যান, তখন হযরত হালিমা স্বীয় স্বামী ও ছেলেকে নিয়া রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির হন। নবী করীম তখন মদিনা মোনাওয়ারার বাদশাহ্। তিনি স্বীয় দুধ-মাতার সম্মানার্থে আপন চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ হইয়াও তিনি দুধ-মাতার সম্মানে ত্রুটি করিলেন না; বরং নেহায়েত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার তাযিম করিলেন। আপন বাদশাহী বা মর্যাদা কিছুই তাঁহাকে দীন-হীন জীর্ণ পোশাক পরিহিতা নারীর সম্মান করা হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইল না। এই তো নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হযরত উম্মে সলিম

হযরত উম্মে সলিম জনৈকা ছাহাবিয়া। তাঁহার স্বামী আবু-তাল্‌হা বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ্‌র খাছ খাদেম, হযরত আনাস তাঁহার পুত্র। কোন এক সূত্রে তিনি হুযূরে আকরামের খালা। তাঁহার ভাই নবী করীমের সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া শহীদ হন। এইসব কারণে নবী করীম তাঁহার সহিত বিশেষ মহব্বত রাখিতেন। সময় সময় তিনি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন। নবী করীম (দঃ) একবার তাঁহাকে বেহেশ্‌তেও দেখিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের বহু আজীব ঘটনা আছে। একদা তাঁহার এক ছেলে বিমার হইয়া মারা যায়। তখন রাত্রি। তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময় এই সংবাদ স্বামীকে জানাই, তবে হয়ত তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়া পড়িবেন। তাই বুদ্ধিমতী সহনশীলা উম্মে সলিম ছেলের মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও জানাইলেন না। স্বামী কার্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলেন। গৃহে আসিয়া একবার মাত্র ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত উম্মে সলিম বলিলেনঃ ছেলে আরামেই আছে। কথাটি কিন্তু মোটেই মিথ্যা হয় নাই। যেহেতু মুসলমানের জন্য মৃত্যুই আরামদায়ক।

হযরত উম্মে সলিম অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি খানা খাইয়া শেষ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনও হইল। সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেলে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় যদি উহা নিতে চায়, তবে কি উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিতে পারে? উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ না। তখন তিনি আরয করিলেনঃ তবে কোন চিন্তা করিবেন না, ছেলের জন্য ছবর এখ্‌তেয়ার করুন। ইহাতে স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তখনই কেন আমাকে খবর দিলে না?

হযরত উম্মে সলিম এই কাহিনী নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দো'আ করিলেন—যাহার ফলে উক্ত রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তৎপর এক

ছেলের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকেই বড় বড় আলেম হইয়াছিলেন।

হযরত উম্মে সলিমের এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, ছবর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত পছন্দনীয় এবং উহার পরিণাম কত সুখের ও কত সার্থক।

হযরত উম্মে হারাম

হযরত উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্র খালা—হযরত উম্মে সলিমের ভগ্নী। নবী করীম প্রায়ই তাঁহার বাড়ী তশ্রীফ রাখিতেন। একদা তিনি সেখানে দাওয়াত খাইলেন। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাঁহার এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত বলিলেনঃ আমি স্বপ্ন দেখিলাম, আমার উম্মতগণের একদল জাহাজে সওয়ার হইয়া জেহাদে যাইতেছে। সাজ সরঞ্জামে তাঁহাদিগকে আমীর বাদশাহের মত মনে হইল। ইহা শুনিয়া উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন ঐ দলভুক্ত হইতে পারি। হযরত (দঃ) দো'আ করিলেন এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবার হাসিমুখে ঘুম হইতে জাগিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দলের ন্যায় আরও একটি দলের কথা বলিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) এইবারও আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন এই দলেরও একজন হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ না, তুমি প্রথমোক্ত দলে থাকিবে।

হযরত উম্মে হারামের স্বামী ওবায়দা (রাঃ)। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এক সামুদ্রিক অভিযানে গমন করেন। এই সময়েই রাসূলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। তাঁহারা নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূ-পতিত হইয়া হযরত উম্মে হারাম শাহাদত বরণ করেন।

সোবহানাল্লাহ্! হযরত উম্মে হারাম কত বড় সাহসী, নির্ভীক, বাহাদুর ও দীনদার আওরত ছিলেন। তাঁহার ঈমানের জয্বা কত তীব্র বেগবান ছিল। রাসূলুল্লাহ্র নিকট যতবার তিনি জেহাদের কথা শুনিতেন, ততবারই জেহাদে যোগদানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হযরত আবু হুরায়রার মাতা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। প্রথমতঃ, তাঁহার মাতা ছিলেন বেদীন। হযরত আবু হুরায়রা তাঁহার মাতার নিকট সর্বদা দীন ইসলামের কথাবার্তা কহিতেন। দীন ইসলামের মহত্ত্বই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একদিন তাঁহার মাতা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে হযরত আবু হুরায়রার মনে খুব দুঃখ হইল।

হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং দো'আ করিতে বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ দো'আ করিলেন—আয় আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাতাকে তুমি হেদায়ত কর। ইহার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া কে যেন গোছল করিতেছেন। গোছল শেষ করিয়া তাঁহার মাতা দরওয়াজা খুলিলেন এবং পড়িলেন—আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু....। হযরত আবু হুরায়রা খুশীতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে

হাজির হইয়া সব ঘটনা আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্‌কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ও আমার মাতার জন্য দো'আ করুন, যেন আমাদের সহিত সমস্ত মুসলমানের এবং সমস্ত মুসলমানের সহিত আমাদের মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উক্ত দো'আই করিলেন।

ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা

ইমাম রবিয়া তুর্রা মস্ত বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালেক এবং হাসান বস্‌রী (রাঃ) যাঁহারা দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের চেয়েও মশ্‌হুর আলেম তাঁহারা তাঁহার শাগরেদ। তাঁহার পিতার নাম ফিরোজ।

বনি-উমাইয়া বংশের খেলাফতকালে এই ফিরোজ তাহাদের সেনাদলভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি স্ত্রীর নিকট ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া জমা রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ইমাম রবিয়া ঐ সময় মাতৃগর্ভে, ফিরোজ এইবারে সাতাইশ বৎসরকাল বিদেশে কাটাইয়া আসেন।

এদিকে ইমাম রবিয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হন। পরিণত বয়সে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন। এই সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসরের মধ্যে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচে ইমাম রবিয়ার বুদ্ধিমতী মাতা তাঁহাকে মহান আলেম করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে একদিন ফিরোজ বাড়ী ফিরিয়া আসেন। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে স্ত্রী বলেনঃ আশরাফিয়াগুলি অতি যত্নেই রহিয়াছে। ফিরোজ দেখিলেন, তাহার ছেলে ইমাম রবিয়া মস্‌জিদে বসিয়া হাদীস শুনাইতেছেন। তিনি স্বীয় ছেলেকে কওমের ইমামরূপে দেখিতে পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রী তাহাকে বলিলেনঃ আচ্ছা ছেলের এই নিয়ামত বেশী পছন্দনীয়, না ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া? অতঃপর স্ত্রী আরও বলিলেন, আমি বিগত সাতাইশ বৎসরে উক্ত ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচ করিয়া ছেলেকে এলেম হাছেল করাইয়াছি। ফিরোজ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাইয়া সুখী হইয়াছি এবং আমার এই আশরাফিয়া খরচ করা সার্থক হইয়াছে। আর আমরা এমন ছেলের মাতাপিতা হইতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি।

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী ছিলেন একজন মস্তবড় বুযুর্গ। হযরত জন্নুন মিস্‌রী বলেন, তাহার নিকট হইতে আমি বহু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে না, সে কোন গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। যে সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে, সে কখনো বেহুদা কথা বলিতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা হইতে নির্লজ্জ হইতে পারে না।

ইমাম আযম ছাহেব বলেন, আমি হযরত ফাতেমা নিশাপুরীর সমকক্ষ কোন আওরতই দেখি না। তাঁহার নিকট যে-কেহ আজগুবি কোন সংবাদ নিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিত, তিনি পূর্ব হইতেই উহা জানেন। ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় তিনি এন্তেকাল করেন।

আল্লাহু আকবর, কত বড় মর্তবার আওরত ছিলেন তিনি। জন্নুন মিস্‌রী এবং ইমাম আযমের মত বুযুর্গ অলীআল্লাহ্‌গণকেও চমকিত করিত তাঁহার বুযুর্গী। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হামেশা তাঁহার নিকট কাশফ্ হইত। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই তাঁহার এন্তেকাল ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত রবিয়া বিন্‌তে ইসমাঈল

হযরত রবিয়া বিন্‌তে ইসমাঈল সারারাত্রি এবাদতে কাটাইতেন এবং সারাদিন রোযা রাখিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যখন আযান শুনি, তখন কেয়ামতের দিনের ফুৎকারকারী ফেরেশ্‌তার কথা স্মরণ হয়। যখন গরম অনুভব করি, তখন হাশরের মাঠের সূর্যোত্তাপের কথা মনে পড়ে।

তিনি আরও বলিতেন; আমি যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন গায়েব হইতে আমার দোষ-ত্রুটি বলিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে আমি অপরের দোষ-ত্রুটি দেখিতে না পাই এবং চলাফেরা করিবার সময় আমি বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখিতে পাই।

বস্তুত এইরূপ এবাদতকেই এবাদত বলা হয়। সর্বদা নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই আর অপরের দোষ-ত্রুটি দেখা যায় না। আর অপরের দোষ-ত্রুটি না খোঁজাই বুযুর্গীর আলামত। দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম কওম ইসলামের পূত পবিত্র আদর্শ ভুলিয়া কেহই অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া হিংসা-হাছাদে পড়িয়া রসাতলে যাইতেছে। যাহার ফলে কওমের একতা ভ্রাতৃত্ব চিরতরে লোপ পাইতেছে। নিজেরা দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া দীন-দুনিয়া বরবাদ করিয়া অশান্তি ঘটাইতেছে।

হযরত মায়মুনা সওদা

হযরত মায়মুনা সওদা একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি একদা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করি যে, আয় আল্লাহ্‌! আমার বেহেশ্‌তী সাথীকে দেখাইয়া দিন! আদেশ হইলঃ তোমার বেহেশ্‌তী সাথীর নাম মায়মুনা সওদা। সে কুফাবাসী অমুক খান্দানের।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেনঃ আমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে রওয়ানা করিলাম। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি এক দেওয়ানী আওরত, সারাদিন বকরী চরানই তাহার কাজ। তারপর আমি চারণ ভূমিতে গমন করিলাম। দেখিতে পাইলাম হযরত মায়মুনা সওদা নামায পড়িতেছেন। আর তাঁহার বকরীর দলের সহিত এক জায়গায়ই কতিপয় বাঘ বিচরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে হযরত মায়মুনা সওদা নামায শেষ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবদুল ওয়াহেদ! এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত বেহেশ্‌তে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি করিয়া আমার নাম জানিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ তোমার কি জানা নাই যে, প্রথমেই সেখানে উভয় রূহের মহব্বত পয়দা হইয়া গিয়াছে? পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার যে, আপনার বকরী ও বাঘ একই জায়গায় চরিতেছে? তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত মোয়ামালা দুরুস্ত করিয়া নিয়াছি; ফলে আমার প্রভু আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার বকরী ও বাঘের মধ্যের মোয়ামালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

সোবহানাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ রাসূলের এতাআত করিয়া তিনি কত বড় বুযুর্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অহরহ কাশ্‌ফ হইত এবং কারামত যাহের হইত। এমন কি, জন্মের পূর্বের মোয়ামালাত-গুলিও স্পষ্ট তাঁহার ইয়াদ ছিল। আর সাধারণ মানুষ তাঁহাকে দেওয়ানী জ্ঞান করিত। বহু বুযুর্গানের হালাত এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত ছারি সাক্বাতির মুরীদ

হযরত ছারি সাক্বাতির জনৈক খাদেম বলেনঃ আমাদের শায়খের ছিলেন এক মুরীদানী। তাঁহার এক ছেলে মক্তবে লেখাপড়া করিত। একদিন ছেলের ওস্তাদ ছেলেকে কোন কাজে পাঠাইলেন। ছেলে ওস্তাদের আদেশ পালন করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিল।

ওস্তাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছেলের মাতার নিকট গেলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ছবর এখ্‌তেয়ারের নছীহত করিতে লাগিলেন। মুরীদানী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কেন ছবরের নছীহত করিতেছেন? ওস্তাদ বলিলেন আপনার ছেলে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। মুরীদানী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে কখনও পানিতে ডুবিয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে মাতার ডাকে সাড়া দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ওস্তাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। মাতা ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই কাহিনী পরে হযরত ছারি সাক্বাতি ও হযরত জুনায়েদ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা উক্ত আওরতের একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন মুছিবতের পূর্বেই তাহাকে গায়েব হইতে জানান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাঁহাকে জানান হয় নাই—তাই এইরূপ হইয়াছে।

হযরত তোহ্‌ফা

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ একদা আমি কয়েদখানায় গেলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, একটি মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এশ্‌কের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে এবং কাঁদিতেছে। দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পাগলী। মেয়েটি ইহা শুনিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিলঃ আমি পাগল নহি—আমি আশেক।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কাহার আশেক? উত্তরে মেয়েটি বলিলঃ যিনি আমাকে যাবতীয় নেয়ামত দান করিয়াছেন। যিনি সর্বদা আমার নিকট হাজির নাজির, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার।

ইত্যবসরে মেয়েটির মালিক আসিয়া হাজের হইল। সে দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোহ্‌ফা কোথায় আছে? দারোগা ছাহেব বলিয়া দিলেন, সে কয়েদখানার ভিতর আছে; হযরত ছারি সাক্বাতি তাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ মালিক ভিতরে আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলামঃ এই মেয়েটি আমার চাইতে বেশী সম্মানী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে এত হীন অবস্থায় রাখিয়াছ কেন? সে উত্তর করিলঃ আমি তাহাকে বহু মূল্যে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে অতি লাভে বিক্রয় করিব। কিন্তু সে রাতদিন ক্রন্দন করিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে এখন আসল দামে বিক্রি করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ আমি তাঁহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, আপনি দরবেশ, আপনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিয়া সারারাত্রি কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দরওয়াজায় খট্ খট্ আওয়াজ হইল। দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বহু টাকা-পয়সা সংগে নিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "আমি আহমদ ইবনে মোসান্না।

এই টাকাগুলি আপনার নিকট অর্পণ করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি।" টাকাগুলি আমি কবূল করিলাম।

রাত্রি ভোর হইতেই আমি খুশী মনে কয়েদখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্রীতদাসীর মালিকও কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েদখানায় হাজির। বলিলামঃ হে মালিক! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি টাকা নিয়া আসিয়াছি। দাসীকে দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিব। মালিক বলিল, আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি এই দাসীকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য, তাই এই দাসীকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আযাদ করিয়া দিলাম। দাসী তোহ্‌ফা আযাদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। আমিও সমস্ত টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌র রাহে দান করিলাম।

তারপর আমরাও তোহ্‌ফার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। কতদূর যাওয়ার পর তোহ্‌ফাকে হারাইয়া ফেলিলাম। সে কোথায় বিলীন হইল তাহা ভাবিতেও পারিলাম না। পথিমধ্যে আহমদ ইবনে-মোসান্নার মৃত্যু হইল। চলিতে চলিতে আমি ও মালিক মক্কায় পৌঁছিলাম। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে এক চিত্তাকর্ষক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তর হইলঃ সোব্‌হানাল্লাহ্‌! আপনারা এত শীঘ্রই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি তোহ্‌ফা।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আহ্‌মদ ইব্‌নে-মোসান্নার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাঁহার অনেক বুলন্দ মর্তবা হাছেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলাম, আপনার মালিকও আমার সাথে রহিয়াছেন। এই বলিয়াই তাকাইয়া দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোহ্‌ফার মৃত্যু অবস্থা দর্শনে উক্ত মালিকও এন্তেকাল করিলেন। আমি উভয়ের কাফন-দাফন সমাধা করিয়া স্বগৃহে ফিরিলাম।

শাহ ইব্‌নে শুজা কারমানির কন্যা

শাহ ইব্‌নে শুজা কারমানী এক সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ্‌ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করেন। তাঁহার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অন্য রাজ্যের এক বাদশাহ্‌ কন্যার বিবাহের পয়গাম দেন। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর শাহ ইব্‌নে শুজা কারমানি জনৈক যুবকের নামায আদায় করার তরীকায় মুগ্ধ হয় এবং তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। যুবক কন্যাকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কন্যা স্বামীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটি শুক্‌না রুটি রহিয়াছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? স্বামী যুবক উত্তর করিলেনঃ সারাদিন রোযা রাখিয়াছি এফ্‌তার করার জন্য এই রুটি রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়াই কন্যা আপন পিতার বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলেন। যুবক বলিলেন, আমি পূর্বাহ্নেই ধারণা করিয়াছিলাম—বাদশাহ্‌যাদী কি করিয়া আমার বাড়ী কাল যাপন করিবে?

কন্যা বলিলেনঃ কিন্তু, না। আব্বা বলিয়াছেন, তোমার বিবাহ এক দরবেশ যুবকের সহিত দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি যারপর নাই খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার স্বামী দরবেশ নয়; যদি দরবেশ হইবে, তবে কেন ঘরে রুটি জমা রাখিবে? তৎক্ষণাৎ যুবক রুটিটি খয়রাত করিলেন। ফলে কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে যুবকের সহিত ঘর করিতে লাগিলেন।

ওলী, দরবেশগণের জীবনের ছবি ইহাই, যাহা এই ঘটনায় দেখা গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর যাঁহাদের ভরসা এমনি চরম ও পরম তাঁহারাই ওলীআল্লাহ্‌।

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে আওরত নামায পড়ে, রোযা রাখে, গোনাহ ও সওয়াবের কাজের তমীজ করিয়া চলে, হাদীস ও কোরআনের আহ্কামের তাবেদারী করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, মিথ্যা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না, লজ্জা-শরম বাকী রাখে, কাহারো সহিত হাসি মযাক করে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে সদা ইয়াদ রাখে, স্বামীর খেদমত প্রাণপণে করে, তাঁহার জন্য খোশখবরী। তিনি পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রীর অধিকারিণী হন। চিরশান্তিময় বেহেশ্তের দরওয়াজা তাঁহার জন্য খোলা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নেক আওরতগণের মধ্যে এই গুণসমূহ পাওয়া যায়—খোদা পরুস্তি, শরীঅতের পাবন্দ, সতী-সাধ্বী, খেলাফে শারাহ কাজে তওবাকারিণী এবং ইবাদতে লিপ্তা।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এইরূপ স্ত্রীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হউক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে আওরত কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা হায়েয-নেফাসের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শাহাদৎপ্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, সে বেহেশ্তী। বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ যাহার দুইজনই মারা যায়? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, তাহারও এই সওয়াব মিলিবে।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে আওরতের হামল পড়িয়া যায় সে সওয়াবের আশায় যদি ছবর এখতেয়ার করে, তবে ঐ সন্তান পরকালে স্বীয় মাতাকে টানিয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বশ্রেষ্ট রত্ন নেককার স্ত্রী। যে স্ত্রীকে দেখামাত্র স্বামীর মন শান্তিতে ভরিয়া যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্র তাহা পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রী (স্বীয়) ইজ্জত আব্রুর হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আরবীয় রমণীরা দুইটি ভাল কার্যে অভ্যস্ত। প্রথমতঃ সন্তানের উপর খুব মহব্বত রাখে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মালের হেফাযত করে। আফসোসের বিষয়! আমাদের দেশী রমণীরা স্বামীর মালের হেফাযতের দিকে মোটেই খেয়াল করে না। স্বামীর আমানতের হেফাযত করিতে তাহারা একান্তই অলস। এই অলসতার দরুনই তাহারা খায়েন সাজিয়া ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করিতেছে। যাহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় কথা হইতেছে—সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মাতা যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখে—তাহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা উচিত সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি। যেহেতু শিশুদের চরিত্র প্রথম থাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা অতিবাহিত হয় মাতার কোলেই। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক তেমনি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই শিশুকে আদর্শ চরিত্রবান করিয়া তোলার দায়িত্ব মাতারই।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারীকে বিবাহ করিবে; যেহেতু তাহার বোলচাল স্বভাবতঃ নম্র হয়। অর্থাৎ, লজ্জাশীলা হওয়ার কারণে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে অক্ষম হয়। তোমরা তাহাদিগকে সামান্য খরচে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, লজ্জা-হায়া অতি মূল্যবান সম্পদ। ইহাতে কেবল কুমারীকে বিবাহ করার আদেশ হইল না। এক ছাহাবী এক বিধবা আওরত বিবাহ করার কারণে হযরত তাহার জন্য খাছ দো'আ করিয়াছিলেন।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে রমণী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, স্বীয় মান-সম্মানের হেফাযত করে এবং স্বামীর তাবেদারী করে, এইরূপ রমণী বেহেশ্‌তের যে দরওয়াজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। মোটকথা, দীনের যাবতীয় জরুরী আহকামের পা-বন্দ হওয়ার পর, খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রমসাধ্য এবাদত করার প্রয়োজন পড়ে না। শ্রমসাধ্য এবাদতের দ্বারা যে মর্তবা লাভ হয়, উহা স্বামী ও সন্তান-সন্ততির খেদমতের দ্বারা হাছেল করা যায়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বামীর সন্তুষ্টির হালতে যে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, সে বেহশ্‌তী। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যাঁহার চারিটি বস্তু হাছেল হইয়াছে, সে দুনোজাহানের দৌলত হাছেল করিয়াছে। প্রথম, নিয়ামতের শোকর আদায় করা; দ্বিতীয়, জিহ্বা দ্বারা সদা আল্লাহ্‌র যিকির করা; তৃতীয়, বালা-মছিবতে ছবর এখতেয়ার করা; চতুর্থ, স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাযত করা এবং ধোঁকা না দেওয়া।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক রমণী খুব বেশী নফল নামায পড়ে, নফল রোযা রাখে এবং খয়রাত করে; কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা পড়শীদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ সে দোযখী। ঐ ব্যক্তি পুনঃ আরয করিল, এক রমণী নফল নামায ও নফল রোযা বেশী রাখে না, সামান্য পনিরের টুকরা খয়রাত করিয়া থাকে অথচ তাহার দ্বারা পড়শীদের কোন কষ্ট হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ সে বেহেশ্‌তী।

জনৈক আওরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। একটি সন্তান তাহার কোলে ছিল, আর একটি তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ ফরামাইয়াছিলেন, এইসব আওরত প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাছেল করিতে পারিত, তবে বেহেশ্‌তী হইত।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ (আওরতদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রাযী নও যে, (অর্থাৎ, রাযী থাকা উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্বামীর উছিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহ্‌র রাহের রোযাদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী। আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শান্তি ও আরামের জন্য যে-সব সামান পরপারে মওজুদ করা হয়—সে সম্বন্ধে আকাশ ও মর্ত্যবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হইলে পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুগ্ধের ফোঁটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী মিলে না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রি জাগিতে হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণী যদি তাহার স্বামীর সংসার হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর এজাযতে খরচ করে, তবে সেও সওয়াবের ভাগী হয়। রমণী সওয়াবের ভাগী হয় খয়রাত করার উছিলায়, আর স্বামী সওয়াব পায় মাল উপার্জন করার কারণে। ইহা ছাড়া খয়রাত কবূলকারীও সওয়াব পায়—অথচ কাহারো ভাগ হইতে সওয়াব কমে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ দেখ রমণীগণ! তোমরা জেহাদের সওয়াব হাছেল করিতে পারিবে হজ্জের দ্বারাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আওরতদের এবাদতকে কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। জেহাদ শরীঅতের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবাদত। আর সেই এবাদতের ফযীলত রমণীগণ হাছেল করিবেন হজ্জ সমাপন করিয়া। সোব্‌হানাল্লাহ্! কত বড় খোশ-নছীব।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণীদের জন্য জেহাদ নাই, জুমু'আ নাই, এমনকি জানাযার নামাযও নাই (অর্থাৎ, জানাযায় তাহাদিগকে শরীক হইতে হয় না।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আপন বিবিগণকে লইয়া হজ্জ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই হজ্জ করিবার পর বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও (অর্থাৎ, বেলা জরুরত সফরে বাহির হইও না।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। যেহেতু বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্ট (ইহা একটি মশহুর কাহিনী।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা রমণীদের জন্য (رشك) এর বদলে জেহাদের সওয়াব দান করেন। যে আওরাত ঈমান ও সওয়াব তলবের উদ্দেশ্যে (رشك অর্থাৎ, স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর পানি গ্রহণে) ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করেন।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আপন স্ত্রীর সহিত প্রেম ও দাম্পত্য সুলভ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীর সন্তুষ্টি হাছেল করাতেও ছদকার সওয়াব মিলে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠা যে স্বামীর দৃষ্টিকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং স্বামীর হুকুমের তাবেদার হয়। এ ছাড়া স্বামীর জান ও মালের হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ পায়জামা পরিধানকারিণী আওরতের উপর আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী হউক (অর্থাৎ, পর্দানশীন আওরতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বদকার আওরতের "বদী" হাজার পুরুষের বদীর সমান এবং নেককার আওরতের "নেকী" সত্তর আওলিয়ার নেকীর সমান।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আওরত আপন গৃহস্থালী কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে, সে জেহাদের সওয়াব লাভ করিবে (ইন্‌শাল্লাহ্)। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ বিবিগণের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর আশেক হয়।

হাদীস—জনৈক পুরুষ রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে আরয করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি, তখন সে বলেঃ মারহাবা আমার সরদারের এবং বাড়ীর সরদারের। আর সে আমাকে যখন চিন্তিত দেখে তখন বলেঃ দুনিয়া নিয়া আবার কিসের চিন্তা—তোমার আখেরাত তো দুরুস্ত হইয়াছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেনঃ তাঁহাকে খোশ-খবরী দাও যে, সে এবাদতকারিণীদের একজন এবং সে মোজাহেদগণের অর্ধেক সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—আস্‌মা বিনতে-এজীদ নেছারিয়া বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতের আরয করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আওরতকুলের ফরিয়াদ নিয়া হাজির হইয়াছি। পুরুষগণ জুমু'আর নামায, জমা'আত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা, জানাযা নামায, হজ্জ-ওমরা ও ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমানা রক্ষক হিসাবে আমাদের হইতে প্রধান্য হাছেল করিয়াছে। উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আওরতগণকে জানাইয়া দাও যে, এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব তাহাদের জন্য স্বামীর খেদমত, স্বামীর হক আদায়, স্বামীর তাবেদারী ও তাঁহার দেলের সন্তুষ্টি হাছেল করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতগণ সন্তান প্রসব করা হইতে সন্তানকে দুধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাছেল করে, যেমন সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী সেনাদল। আর এই সময়ের মধ্যে যদি সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদী-দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীকুল! স্মরণ রাখ, তোমরা যাহারা নেক্কার তাহারা সবার আগে বেহেশ্‌তে দাখেল হইবে। তাহাদিগকে স্নান করাইয়া খুশ্‌বু মাখিয়া প্রত্যেকের স্বামীর হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে। লাল ও জরদ রঙ্গের সওয়ারীর উপর তাহাদের সহিত উপবিষ্ট মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে ছেলে-মেয়ে থাকিবে।

হাদীস—হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে আওরত স্বামীর প্রবাসকালে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং বিলাস সৌন্দর্যদ্রব্য পরিহার করিয়া চলে, সে বেহেশ্‌তে তাহার স্বামীর সহিত বাস করিবে। তাহার স্বামী যদি বেহেশ্‌তী না হয়, (অর্থাৎ, ঈমানের সহিত তাহার মৃত্যু না হয়) তবে তাহার বিবাহ কোন এক শহীদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা সম্পাদন করিবেন।

হাদীস—হাকীম ইবনে-মাবিয়া স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের উপর আমাদের বিবির কি হক আছে? উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি পানাহার কর, তখন তাহাকেও পানাহার করাও। তুমি যখন পরিধান কর, তাহাকেও তখন পরিধান করাও। তাহার উপর যুলুম করিও না।

হাদীস—হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার আখলাক-চরিত্র ভাল সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। ঐ ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে স্বীয় বিবির নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কথার তাবেদারী করে না তাহাকে প্রথমতঃ উত্তম নছীহত কর। তারপর তাহার সহিত উঠা-বসা শোয়া পরিত্যাগ কর। এইবার যদি মানে (অর্থাৎ তোমার কথার তাবেদারী করে,) তবে আর বাড়াবাড়ি করিও না।

রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে মারিও না। (পরপুরুষকে জেওরের ঝনঝনানী শব্দ শুনাইও না।) অত্র আয়াতের মারফত আওরতের কথাবার্তার আওয়াজকে হেফাযত করার জন্য এবং পর্দা-পুশিদার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীগণ! তোমাদের অধিকাংশকেই আমি দোযখী দেখিতেছি। কতিপয় আওরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র গযবের কথা অধিক বলিয়া থাক (অর্থাৎ বল, অমুকের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযেল হউক) এবং স্বামীর নাফরমানি খুব বেশী কর। স্বামী প্রদত্ত চীজকে না-পছন্দ কর। একদা জনৈক আওরত বিমারীকে খারাপ বলিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ওহে অজ্ঞান। বিমারীকে খারাপ বলিও না; যেহেতু উহা দ্বারা গোনাহ্ মাফ হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকারিণী আওরতকে কিয়ামতের দিন ধারাল কাঁটাবিশিষ্ট অগ্নির কোর্তা পরিহিত অবস্থায় উঠান হইবে। কাঁটাগুলি তাহার শরীরে বিঁধিতে থাকিবে। আর আগুনে শরীরের চামড়া পুড়িতে থাকিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক আওরত বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হইয়াছিল।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এক আওরত অপর আওরতের সহিত সাক্ষাৎ করার পর স্বীয় স্বামীর নিকট এমন বর্ণনা যেন না দেয়, যাহাতে স্বামীর চোখে অপর আওরতের ছবি ভাসিয়া উঠে।

হাদীস—একদা রাসূলুল্লাহ্‌র দুই বিবি তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক নাবিনা (অন্ধ) ছাহাবী আসিলেন। হযরত (দঃ) উভয় বিবিকেই পর্দার আড়ালে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ সে ত অন্ধলোক। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ সে অন্ধ হইলেও তোমরা ত অন্ধ নও।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী পরহেযগার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্বামীর বেহেশ্‌তী হুরগণ বলিতে থাকেঃ তুমি (স্ত্রীলোক) অভিশপ্ত হও। সে তোমার মেহ্‌মান—সে অতি শীঘ্রই আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কখনো এইরূপ দোযখী আওরত দেখি নাই, অর্থাৎ, আমার যমানার পর এইরূপ আওরত পয়দা হইবে—যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও উলঙ্গের মতই মনে হইবে। তাহারা খুব সাজিয়া রং ঢং করিয়া শরীরকে হেলাইয়া দুলাইয়া চলিবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে বেশী চুল বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এইরূপ আওরতগণের নছীবে বেহেশ্‌তের খোশবুও মিলিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রীলোক পর পুরুষকে বা আওরতকে দেখাইবার জন্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) একদা সফরে ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক আওরত বোঝা বহনকারিণী এক উটনীকে লা'নত করিতেছে। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেনঃ উটনীটি যখন আওরতের লা'নতের যোগ্য, তখন বোঝাগুলিকে উটনীর পিঠ হইতে নামাইয়া ফেল। আর আওরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

সংশোধনমূলক কাহিনী

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের যমানায় এনাক্ব নাম্নী এক আওরত ছিল। সর্বপ্রথমে সে যেনা করিয়া তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার বদকার্য হইতে হাতীর মত বড় বড় সাপ ও গাধার মত বড় বড় শকুন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহারা এনাক্ব নাম্নী আওরতকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। মোটকথা, বদকার্যের নতিজা এমনি ভীষণ হইয়া থাকে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কোথায় এই যমানায় তো কাহাকেও তেমন শাস্তি ভোগ করিতে দেখি না! কিন্তু ইহাকে একমাত্র আখেরী নবীর উছিলা-ই বলিতে হইবে। রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবীর তোফায়েলে যদিও আমরা ইহকালে ঐরূপ ধ্বংসাত্মক

আযাবে পতিত হইতেছি না, তথাপি গোনাহের কার্যের জন্য আখেরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, নিঃসন্দেহ।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, জবান, দেল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও যেনা হইয়া থাকে। যেমন পর পুরুষের দর্শন করা চোখের যেনা, পর পুরুষের কথা শ্রবণ করা কানের যেনা। পর পুরুষের সহিত হাত মিলান, কাঁধে হাত রাখা, হাতের যেনা। পর পুরুষের বাড়ী চলাফেরা করা পায়ের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথাবার্তা বলা জবানের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া মনে আনন্দ লাভ করা দেলের যেনা। এমনিভাবে সামান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাজারো বদকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই এই সব গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সতর্ক থাকা উচিত।

ওয়ায়েলার কাহিনী

এই আওরত হযরত নূহ নবীর বিবি। সে ছিল বেঈমান। হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের যমানায় যখন প্লাবন শুরু হইল, তখন নূহ (আঃ) ঈমানদার লোকগণসহ বিশাল কিশ্তীতে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার এক বেঈমান পুত্র ও এই বিবিকে কতভাবে বুঝাইয়া ঈমান আনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ বদ-নছীবরা কিছুতেই ঈমান আনিল না; বরং প্লাবনে বিশ্বাস না করিয়া হযরত নূহ (আঃ)-কে টিট্কারী দিতে লাগিল। অবশেষে প্রবল প্লাবনে সারা দুনিয়া ভাসিয়া গেল। তাহারাও পানিতে ডুবিয়া মরিল।

এই সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আওরত নবীর বিবি হইয়াও আল্লাহ্র গযব হইতে বাঁচিতে পারিল না। সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায়, কাহারো বাপ-ভাই বুযুর্গ থাকিলেও তাহার কোন ফায়েদা নাই, তাহাকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতেই হয়।

হযরত লূত (আঃ)-এর বিবি

এই আওরত কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাহায্য করিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলেন, হযরত লূতের কওমের কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে। তিনি লূত (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, ঈমানদার লোকদের নিয়া রাতারাতি বস্তির বাহির হইয়া যাইতে। আরও আদেশ করিলেন, যাইবার সময় পিছন দিকে না তাকাইতে।

এদিকে ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র আদেশে ছোবহে-ছাদেক হইতে না হইতে উক্ত কওমের উপর আযাব শুরু করিয়া দিলেন। হযরত লূত (আঃ) ঈমানদার লোকগণকে নিয়া রওয়ানা করিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে উক্ত কাফের আওরতও চলিল। বেঈমান লোকদের উপর পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই আওরত কার্যতঃ বেঈমান কাফেরদের মতই ছিল। তাই পিছনদিকে ফিরিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাৎ একটি পাথর ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিল।

এই বদবখ্ত আওরতের উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবির কাহিনীর সহিত ইহারও উল্লেখ হইয়াছে। উহার মতই সে পয়গম্বরের বিবি হইয়াও ধ্বংস হইল, দোযখী হইল। কারণ সে সত্য পথের পথিক ছিল না।

কাফের আওরত ছদুফের কাহিনী

হযরত ছালেহ্ (আঃ)-এর যমানার কথা। এই কাফের আওরতের আচার-ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ইহার মতই আর এক আওরত ছিল। তাহার ছিল বহুসংখ্যক বকরী। সমগ্র বস্তিতে একটি মাত্র কূয়া ছিল। সেই কূয়া হইতেই সমস্ত জানোয়ার পানি পান করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ছালেহ্ আলাইহিস্‌সালামকে বহু মো'জেযা দান করিয়াছিলেন। হযরত ছালেহ্ (আঃ) একবার মো'জেযা বলে শক্ত পাথর হইতে বিরাট আকৃতির উটনী বাহির করিয়াছিলেন। এই উটনী উক্ত কূয়া হইতে পানি পান করিত। উহা একদিন পর পর এত পানি পান করিত যে, কূয়া একেবারে শুকাইয়া ফেলিত। ফলে উটনী যেদিন পানি পান করিত ঐদিন আর অন্য কোন জানোয়ার পানি পান করিতে পারিত না। তাই উক্ত আওরতদ্বয় দুষ্ট দুইজন পুরুষকে বলিল, এই উটনীর কারণে আমাদের জানোয়ারগুলি একদিন পর পর পানি পান করিতে পারে, ইহাতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও, তবে আমরাও তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

তারপর বদবখ্‌ত পুরুষ দুইটি লোভে পড়িয়া তলোয়ার হাতে উটনীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। উটনী আসা মাত্র তাহারা তলোয়ার হস্তে আক্রমণ করিয়া উটনীকে মারিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা কওমের উপর আযাব নাযিল করিলেন। হযরত জীব্‌রায়ীল আমীন এমনি বিকট ও ভয়ংকর আওয়াজ করিলেন যাহাতে সমস্ত বেঈমান লোক মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিল।

নাউযুবিল্লাহ্! দুইটি বদ আওরতের কারসাজির দরুন সমস্ত কওমের উপর আযাব নামিয়া আসিল। তাই সর্বদা এইসব গোনাহ্‌গারদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা উচিত।

আরবিলের কাহিনী

হযরত ইলিয়াস নবীর যমানার কাহিনী। এই আরবিল ছিল যালেম বাদশাহের বেগম। সে নিজেও ছিল বড়ই নির্দয়, বেরহম আওরত। বহু পয়গম্বর ও ওলিআল্লাহ্‌কে সে যুলুম করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

আরবিলের প্রতিবেশীনী ছিল এক নেকবখ্‌ত আওরত। তাহার ছিল মনোরম তরুতাজা এক বাগিচা। একদা আরবিলের লোভ হইল যেমন করিয়াই হউক কৌশলে বাগিচাটি হস্তগত করিতেই হইবে। আর বাগিচা হস্তগত করিতে হইলে উক্ত আওরতকেও জীবনে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এখন তাহাকে হত্যা করিবার উপায় কি?

ঘটনাচক্রে বাদশাহ্ একবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। রাজ্যভার ছাড়িয়া গেল বেগমের হাতে। সুযোগ বুঝিয়া বেগম আরবিল বাগিচার মালিনীকে হত্যা করার ফন্দী আঁটিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করিল। বাগের মালিনীকে রাজ দরবারে ডাকিয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ কি হে! তুমি নাকি বাদশাহর বদনাম করিয়াছ? গালিগালাজ করিয়াছ? আওরতটি বিস্মিত হইয়া অস্বীকার করিল। বেগম মিথ্যাবাদী নকল সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে হাজির করিল। তাহারা বলিলঃ হাঁ, সত্যই সে বাদশাহ্‌র বদনাম ও গালিগালাজ করিয়াছে। অতঃপর বেগম আওরতটিকে কতল করিয়া বাগিচাটি স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ সফর শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী নাযিল করিলেন। "হে নবী! বাদশাহ্‌কে বলিয়া দিন, তাহার বেগম এক নির্দোষ বান্দাকে হত্যা করিয়া তাহার বাগিচা দখল করিয়া লইয়াছে। বাদশাহ যদি উক্ত বাগিচা তাহার ওয়ারিশদেরকে ফিরাইয়া দেয় এবং উভয়ে মিলিয়া তওবা করে, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) এই সংবাদ বাদশাহ্‌কে প্রাদন করিলেন। বাদশাহ্ বেগম উভয়েই এই সংবাদে কর্ণপাত করিল না, বরং হযরত ইলিয়াসের দুশ্‌মন সাজিল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াসকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই যালেম বাদশাহ্‌র এক আদরের ছেলে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই দুঃখে বাদশাহ ও বেগম একেবারে মর্মাহত হইয়া গেল। কয়দিন পরই আবার এক প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ্ আসিয়া তাহার রাজ্য ছিনাইয়া নিল এবং তাহাকে সবংশে নিহত করিল। এইভাবে যালেম বাদশাহ্‌র সকল গর্ব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং সে সমূলে ধ্বংস হইল।

যুলুমের প্রতিফল, যালেমের গর্ব ও অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি নিয়তির বুকে চিরকালই হইয়া থাকে। ইহার নতীজা বড়ই ভয়ানক ও মর্মান্তিক। অহঙ্কারী ও অত্যাচারী মানব জাতির কলঙ্ক—ইবলীস্।

নায়েলার কাহিনী

আরবের এক গোত্রের নাম জিরহাম। হযরত ইসমাঈলের আর্বিভাবের পর হইতেই আরবের অধিবাসী এই গোত্রের সৃষ্টি। এই গোত্রেরই এক আওরতের নাম নায়েলা। একদা সে পবিত্র কা'বা শরীফে এক পুরুষের সহিত যেনা কার্যে লিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার গযবে উহারা দুইটি পাথরে পরিণত হইয়া যায়। পুরুষটির নাম ছিল আসফ। পরবর্তীকালে জনগণ উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে রাখিয়া দেয়। আর জাহেল লোকেরা পাথরদ্বয়কে পূজা করিতে শুরু করে। আখেরী নবী উক্ত পাথরদ্বয়কে অন্যত্র ফেলিয়া দেন। ফলে জনসাধারণ উক্ত পাথর পূজার পাপ হইতে রেহাই পায়।

যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, কাবা ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে যে বদবখতই চেষ্টা করিয়াছে এমনিভাবে ধ্বংস হইয়াছে। জাহান্নামের কঠিন প্রজ্বলিত অগ্নিই তাহার নছীব হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী

হযর ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর যমানা। এক ছিল বাদশাহ্। আর বেগমের ছিল পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা। বেগমের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত। এই সময় তাহার খেয়াল হইল, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা, নাজানি বাদশাহ্‌র মন অন্য কাহারো দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধা বেগম এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়িল। অবশেষে ঠিক করিল তাহার যুবতী কন্যাকেই বাদশাহ্‌র অর্ধাঙ্গিনী বানাইতে হইবে; সে যে কোন প্রকারেই হউক। বেগম রাত-দিন এই সুযোগই তালাশ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন বাদশাহ্‌কে ও কন্যাকে নানা কৌশলে বুঝাইতে লাগিল। কন্যাও ছিল পরমা সুন্দরী। ক্রমে ক্রমে উভয় বদবখ্‌তই রাজী হইয়া গেল।

এই সংবাদ হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্‌সালাম জানিতে পারিলেন। তিনি বাদশাহ ও বেগমকে বুঝাইলেন। উপদেশ দিলেন যে, বাদশাহ্ ও এই কন্যার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হারাম হইবে। কাজেই তোমরা ইহা করিও না। বেগম ইহাতে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে হত্যা করিল। হযরতের ছের মোবারক হইতে অবিরাম রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইল। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইল না।

অবশেষে বাদশাহ বাধ্য হইয়া সেকালীন আলেমগণের নিকট পরামর্শ চাহিল। আলেমগণ বলিলেন, হযরতের হত্যাকারিনীকে হত্যা করার পূর্বে এই রক্তধারা বন্ধ হইবে না। এদিকে এক

আদেল বাদশাহ্ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর হামলা করিল। যাহার ফলে সত্তর হাজার কাফেরসহ বাদশাহ্‌কে সবংশে নিহত করিল। তারপর হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)-এর ছের মোবারকের রক্তস্রোত বন্ধ হইল।

নফসানী খাহেশে পড়িয়াই বাদশাহ্ ও বেগম সবংশ নিপাত হইল। আরও সত্তর হাজার কাফের মারিল। পরন্তু কাহারো আশা পূর্ণ হইল না। নফ্‌স মানুষকে চিরকালই এমনি বিপদের সম্মুখীন করিয়া থাকে। তাই নফ্‌সের খাহেশে কোন কাজ করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহ্‌র গযব যখন নামিয়া আসে তখন প্রতিবেশীকেও সেই আযাবে লিপ্ত হইতে হয়।

মহান আবেদের বিবির কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরত বলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাঁহার যমানায় ছিল এক যাহেদ আবেদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার গায়ে খুব শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে যমানার বাদশাহ্ ছিল যালেম। সে ছিল উক্ত আবেদের দুশ্‌মন।

একদা বাদশাহ আবেদের বিবিকে প্রলোভ দিল যে, তোমার স্বামীকে যদি গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে বেগমরূপে বরণ করিব। ইহাতে বদবখত বিবি লোভে পড়িয়া রাযী হইল। নিদ্রাবস্থায় নেক্‌কার স্বামীর হাত-পা বাঁধিয়া বাদশাহ্‌র হাওয়ালা করিয়া দিল।

এই নেক্‌কার আবেদ স্বামীর নাম শামছুন। বাদশাহ্ তাহাকে রাজ দরবারে হাজির করিবার হুকুম করিল। তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করার পর তাঁহাকে শূলে চড়াইবার হুকুম করিল। যথাসময়ে শূলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। বহু রাজ-কর্মচারী তামাশা দেখিতে আসিল।

মহান আবেদ শামছুন এদিকে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিলেন। ফলে বাদশাহ্‌র শাহী মহল ধ্বসিয়া পড়িয়া বাদশাহ্ মহলের নীচে চাপা পড়িল। সকলেই বাদশাহ্‌র উদ্ধার কার্যে মশ্‌গুল হইল। আবেদ শামছুন নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিলেন এবং মোনাফেক বিবিকে তালাক দিলেন। বদবখ্‌ত আওরত ক্ষণস্থায়ী লোভের মোহে পড়িয়া দুনো জাহানের দৌলত নেক্‌কার স্বামীর সঙ্গ হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আশা-ভরসাও তাসের ঘরের মত উড়িয়া গেল। মোনাফেকীর উপযুক্ত সাজা পাইল।

হযরত জুরীহের তোহ্‌মতকারিণী আওরত

রাসূলে করীমের পূর্ববর্তী যমানায় এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার মোবারক নাম হযরত জুরীহ। অতি অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহ্‌র এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জনগণ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি এবাদতখানা বানাইয়া এবাদতে মশ্‌গুল হন।

একদিন তিনি নফল নামায পড়িতেছেন। এমন সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলিয়া ডাকে সাড়া দিলেন না। ইহাতে মাতা রাগ হইয়া ছেলেকে বদদো'আ দিলেন—'ইয়া আল্লাহ্! সে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, অতএব, তাঁহাকে তুমি যেনাকারী আওরতের তোহমত লাগাইও।'

যেহেতু মা-বাপের হক সব চাইতে বেশী। তাই শরীঅতে এই মাসআলাহ্ রহিয়াছে যে, নফল নামায ছাড়িয়া মা-বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই মাসআলাটি হযরত জুরীহ জানিতেন না; তাই তিনি মাতার ডাকে সাড়া দেন নাই। সুতরাং মাতার দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইয়াছিল।

হিংসুকের দল শীঘ্রই হযরত জুরীহের পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অপমানিত করার জন্য এক যেনাকারিণীকে ঠিক করিল। বলিল, যখন তোমার সন্তান গর্ভে থাকিবে, তখন তুমি সকলের নিকট বলিবে, ইহা একমাত্র জুরীহের কার্য। কমবখ্‌ত আওরত তাহাই করিল।

এইবার হিংসুকের দল হযরত জুরীহের নিকট গমন করিল। বলিল, কি হে! তুমি না এত আবেদ জাহেদ, তবে কেন এই আওরত তোমার নামে কুৎসা রটনা করিতেছে? এই বলিয়া তাহারা হযরত জুরীহের এবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আওরতটি একটি সন্তান প্রসব করিল। হযরত জুরীহ সদ্যপ্রসূত শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা কে? খোদার মহিমা অপার, সৃষ্টের বুঝা ভার! শিশুর মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। স্পষ্টভাবে এক রাখালের নাম বলিয়া দিল, যে ঐ হিংসুক-দলেরই একজন।

হযরত জুরীহের কারামত দর্শনে হিংসুকের দল তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং তাঁহার এবাদতখানাকে স্বর্ণে তৈরী করিয়া দিতে চাহিল। হযরত জুরীহ বলিলেন, না, আগে যেমন ছিল, তেমনি বানাইয়া দাও। আমার নিকট মাটির ঘরই পছন্দনীয়। অতঃপর হযরত জুরীহ আপন মনে এবাদত করিতে লাগিলেন। হিংসুকেরা হিংসার অনলে দগ্ধ হইল। কিন্তু মাতার ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে এই পেরেশানী উঠাইতে হইল। কাহাকেও বদদো'আ করিতে নাই। যেহেতু বদদো'আ করার মধ্যে কোনই মুছলেহাত নাই।

বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত

ছহীহ্ বোখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বনি-ইস্রায়ীলের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই কওমের এক আওরত এক বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখে। উহাকে কিছুই পানাহার করিতে দেয় নাই। কিংবা উহাকে ছাড়েও নাই, যাহাতে সে চতুর্দিক বিচরণ করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে। এইভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বিড়ালটি মারা যায়।

এই নিষ্ঠুর দয়াহীন কার্যের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আওরতকে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দেখিয়াছেন, উক্ত বিড়ালটি দোযখে আওরতটির বুকের উপর বসিয়া স্বীয় নখ দ্বারা তাহার বুক চিরিতেছে, নখের দ্বারা আঁচড় কাটিতেছে। মোটকথা, জীব-জানোয়ার এক কথায় কাহারও উপর বে-রহমী করা উচিত নয়। যেহেতু বে-রহমীর শাস্তিও আল্লাহ্ তা'আলা বে-রহমীর সহিতই দিয়া থাকেন। অতএব, সকলের প্রতি সদা সদয় হওয়া আবশ্যক।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত

হযরত ওসমান গণী রাযিআল্লাহু আন্হু বলেনঃ এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় আবেদ। আর এক আওরত ছিল ভয়ানক দুষ্ট। আওরতটি একদা এক বাঁদীকে আবেদের বাড়ী পাঠাইল। সে আসিয়া আবেদকে বলিল, আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী চলুন। টাকা-পয়সা মস্ত বড় একটি লেনদেন আছে, উহাতে আপনি সাক্ষী থাকিবেন। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য হওয়া বড়ই সওয়াবের কাজ। অতএব, শীঘ্রই চলুন।

আবেদ কিছুতেই বাঁদীর কথা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, খুব মজবুত একটি ঘর। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বাঁদী দুষ্ট আওরতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দরওয়াজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিল। আবেদ দেখিলেন, ঘরের মধ্যে উক্ত আওরত শরাব হাতে বসিয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

আওরত আবেদকে দেখিয়া বলিলঃ এখন তুমি আমার হাতে আসিয়াছ। এখন বাধ্য হইয়া তোমাকে যে কোন একটি খারাব কাজ করিতেই হইবে, নতুবা আমি তোমাকে জানে শেষ করিয়া ফেলিব। তুমি এখন আমার সহিত যেনা কর; অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা কর, কিংবা এই শরাব পান কর। একটা তোমাকে করিতেই হইবে নতুবা রক্ষা নাই।

আবেদ ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শরাব পান করাই এখতেয়ার করিলেন। শরাব পান করার পরই মস্তির হালতে অপর দুইটি খারবীও করিয়া ফেলিলেন। দুষ্ট আওরতের উদ্দেশ্য সফল হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবেদের পরহেযগারী নষ্ট করা।

চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যত বড় বড় গোনাহের সূচনা ছোট গোনাহ হইতেই। কাজেই গোনাহ ছোট হউক, বড় হউক একদিক দিয়া সকলই সমান। পরহেযগারী বড় সম্পদ। ইহাকে বজায় রাখিতে জীবনপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধটি প্রত্যেক গোনাহেই প্রযোজ্য।

বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বর এক পানিপূর্ণ হাউযে দো'আ পড়িয়া ফুঁক দিয়াছিলেন। যার ফলে কোন বদকার আওরত ঐ হাউযের পানি পান করিলে তাহার চেহারা কুশ্রী হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানার পরও ঐ হাউযের উক্ত প্রতিক্রিয়া বাকী ছিল।

এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হন। বস্তুতঃ সন্দেহ সত্যই ছিল। তিনি কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কাজী ছাহেব উক্ত হাউযের পানির উপরই ফায়সালা করেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পানি পান করানোর দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির একটি ভগ্নী ছিল। সে দেখিতে ঠিক তাহারই মত। স্ত্রীলোকটি চালাকি করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহার ভগ্নীকে পাঠাইল। তাহার ভগ্নী ছিল নেককার তাই হাউযের পানি পান করাতে তাঁহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। সকলেই বাড়ী ফিরিল।

ভগ্নীটি বাড়ী গিয়া যখন কথা বলিতে লাগিল, তখন তাঁহার মুখের শ্বাস লাগিয়াই ধোঁকাবাজ আওরতটি কুশ্রী চেহারা ধারণ করতঃ মারা গেল। মোটকথা, ধোঁকাবাজী ঠগবাজীর সাজা চিরকালই নির্ধারিত। তাই কখনো কোন অবস্থাতেই ধোঁকাবাজী করিতে নাই। উহার পরিণাম নেহাত জঘণ্য।

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আবের কাহিনী

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আব হাসানের বিবি। এযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হযরত হাসানের দুশ্‌মন। সে চক্রান্ত করিয়া এই আওরতের দ্বারা হযরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে এবং আওরতকে ওয়াদা দিয়াছিল ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তাহাকে স্বীয় মহিষীরূপে বরণ করিবে।

যায়দা লোভে পড়িয়া ইমাম হাসানকে বিষ খাওয়াইল। বিষের প্রতিক্রিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলিল। অবশেষে ইমাম এন্তেকাল করিলেন। এবার যায়দা এযীদকে তাহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইল। কিন্তু এযীদ কিছুতেই তাহাকে বরণ করিল না। ফলে বদবখ্‌ত যায়েদা একূল-ওকূল সবই হারাইল। মোনাফেকীর অগ্নিতে সে চিরতরে জ্বলিতে লাগিল। এইভাবে সে সামান্য তুচ্ছ যালেম বাদশাহ্‌র বেগম হইবার আশায় দীন দুনিয়া খোয়াইল। তাই প্রবাদ প্রচলিত আছে— লোভে পাপ, পাপে বিনাশ।

বিবি যুলেখার কাহিনী

বিবি যুলেখার প্রথম শাদী হয় মিসরের উজিরের সহিত। একদা উজীর হযরত ইউসুফকে ক্রীতদাসরূপে খরিদ করিয়া বিবি যুলেখার হস্তে অর্পণ করে। কিছুদিন লালন-পালন করিবার পর বিবি যুলেখা হযরত ইউসুফের উপর আশেক হইয়া পড়ে। ইহা জানিতে পারিয়া উজীর মুছলেহাত ভাবিয়া হযরত ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন।

এক যুগ পর মিসরের বাদশাহ্ হযরত ইউসুফকে কয়েদখানা হইতে মুক্তি দেন। তখন হযরত ইউসুফ বাদশাহ্কে বলিয়াছিলেন, উজীরের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুনঃ কাহার অন্যায়। বাদশাহ্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন যুলেখা। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ সম্পূর্ণ পাক পবিত্র, যত অন্যায় সবই আমার ভুল মাত্র।

পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন উক্ত উজীরের এন্তেকাল হইয়াছে। ইহার পর হযরত ইউসুফ, বিবি যুলেখাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। ইহাকে একমাত্র সত্য কথার অমৃতময় ফলই বলিতে হইবে। বিবি যুলেখার সত্য কথা বলার দরুন এবং মিথ্যা তোহ্মত না লাগানোর বদৌলতেই তিনি পরিশেষে একদিকে বাদশাহ্র পত্নী অন্যদিকে নবীর নেক বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য চিরজয়ী; উহার জয় সুনিশ্চিত অবধারিত।

কারূণের ধোঁকাবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বরের জমানায় কারূণ এক মালদার ব্যক্তি ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে যাকাত আদায় করিতে বলেন। ইহাতে সে দেখিল তাহার অনেক মাল কমিয়া যাইবে। সে ছিল কৃপণের একশেষ। অসংখ্য অগণিত ধন-মাল হইতে একটি পয়সা খরচ হইতে দেখিলেও সে পেরেশান হইয়া পড়িত। জানের চেয়েও ধন ছিল তার নিকট প্রিয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা শুনামাত্র সে তাঁহাকে মালী এমনকি জানী দুশ্মন ঠাওরাইল।

তারপর সে এক দুষ্ট আওরতকে বহু টাকা-পয়সা দিয়া বাধ্য করিল। তাহাকে বলিল, তুমি কেবল মূসা আলাইহিস্সালামের নামে রটনা করিবে যে, সে তোমার সহিত যেনা করিয়াছে। (নাউযুবিল্লাহ্!) লোভে পড়িয়া আওরত রাযী হইল।

একদা হযরত মূসা (আঃ) এক বিরাট মাহ্ফিলে ওয়ায করিতেছিলেন। তিনি যখন ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি যেনা করে তাহার এই শাস্তি, তৎক্ষণাৎ কমবখ্ত কারূণ বলিলঃ যদি আপনি এমন কাজ করেন, তবে কি শাস্তি? হযরত মূসা (আঃ) বলিলেনঃ আমারও ঐ শাস্তিই। তখন সে বলিল, অমুক আওরত বলে যে, আপনি তাহার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। উক্ত আওরত সেখানেই উপস্থিত ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে? সত্য সত্য বল। আওরতের দেলে হঠাৎ আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হইল। সে বলিয়া উঠিলঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আপনি নিশ্চয়ই পাক পবিত্র। সে আমাকে বহু ধন-সম্পদ দিয়া রাযী করাইয়াছিল যে, আমি আপনার নামে মিথ্যা তোহ্মত লাগাই। এখন আমি তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

এই ঘটনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর দেলে খুব কষ্ট লাগিল। তিনি কারূণের জন্য বদদো'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর ফরিয়াদ কবূল ফরমাইলেন। কারূণ তাহার সীমাহীন ধন-সম্পদ মালমাত্তাসহ মাটিতে গাড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার সকল অহঙ্কার ও গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আওরতটি ধন-মালের লোভে পড়িয়া প্রথমতঃ ভ্রান্ত পথে ছিল। পরে বুদ্ধি বলে সত্য কথা বলিয়া দুনো জাহানের নাজাত হাছেল করিল।

গোনাহ্ স্বীকারকারিণী আওরত

একদা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে এক আওরত হাজির হইল। সে শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া যেনা করিয়াছিল। শরীঅতে হুকুম রহিয়াছে, যেনাকারীকে পাথরের আঘাতে মারিয়া ফেলার। উক্ত আওরত এই হুকুম জানিত। তবুও সে নিজকে এই পাপ হইতে ইহ দুনিয়াতেই পাক করিবার ইচ্ছা করিল।

তাই সে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট নিজ মুখে তাহার স্বকীয় পাপের কাহিনী বর্ণনা করিল। হযরত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, এরূপ সত্যবাদিনী যেনা করিতে পারে। তাই তিনি বলিলেনঃ না, তুমি যেনা কর নাই। কিন্তু আওরতটি তিনবার যখন স্বীকার করিল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আচ্ছা যাও, এখন তোমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, পরে আসিও।

সন্তান প্রসব করার পর আওরতটি আসিয়া পুনরায় হযরতের নিকট হাজির হইল। অর্থাৎ সে প্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল নিজকে শরীঅতের শাস্তির দ্বারা পাক ছাফ করার জন্য। এইবার হযরত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

আওরতের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহার কুৎসা করিতেছিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ খবরদার! তাহার সম্পর্কে কিছু বলিও না; যেহেতু তাহার তওবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্তর গোনাহ্‌গারের তওবার সমান হইয়াছে। সে আল্লাহ্‌র ভয়েই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া জীবন দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে গোনাহ্ হইতে দূরে থাকিবার এবং তওবা করিবার তৌফীক দিন।

রাসূলে মাক্‌বূলের পাক শামায়েল

[অর্থাৎ চাল-চলন]

১। বায়হাক্বী হযরত বরা ইবনে-আযেব হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) ছিলেন সৌন্দর্য্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না বা অতি খাটও ছিলেন না অর্থাৎ মধ্যম কদ ছিলেন।

২। ইবনে-সাআদ ইসমাঈল ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেহ যে কোন কষ্ট দিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতেন।

৩। ইমাম তিরমিযী হিন্দ ইবনে-আবি হালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চলিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে পায়ে এরূপ ভর রাখিয়া চলিতেন, যাহাতে মনে হইত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখিতেছেন এবং উঠাইতেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাইতেন যে, দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হইতে নিম্নদিকে নামিতেছেন। পা খুব আজিযির সহিত বাড়াইতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখিতে হইলে পুরাপুরি ঘুরিয়া দেখিতেন (অর্থাৎ আড় চোখে চাহিতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখিতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করিতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচা চোখে নজর করিতেন (অর্থাৎ, বেহায়ার মত চোখ উল্টাইয়া দেখিতেন না।) কাহারো সাক্ষাৎ ঘটিলে আগেই তিনি সালাম করিতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কথা বলিবার সময় ধীরে ধীরে কহিতেন। যাহাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। এত অধিক ধীরে